● কাব্যসাহিত্যে মাইকেল মধুসূদন

কাব্যসাহিত্যে

মাইকেল মধুসূদন

শ্রীকনক বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্.

বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক

স্কটিশ চার্চ কলেজ : কলিকাতা

পুনর্লিখিত তৃতীয় সংস্করণ

এ· মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং (প্রাইভেট) লিঃ কলিকাতা

উৎসর্গ

পরম পূজনীয় পিতৃদেব

বঙ্গসাহিত্যের একনিষ্ঠ সাধক

স্বর্গত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের

পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশ্যে

আমার এই গ্রন্থখানি

উৎসর্গীকৃত হইল

—গ্রন্থকারের নিবেদন

মধুসূদনের কবিপ্রতিভার, কবির সমস্ত কাব্যগ্রন্থের আলোচনা ও বিশ্লেষণ এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য। বহুকাল পূর্বে গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইয়াছিল। গ্রন্থ-প্রকাশের এক বৎসর কালের মধ্যে গ্রন্থখানির প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হয়। অতঃপর ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ মুদ্রিত হইয়াছিল। সেই সংস্করণটিও অনেকদিন হয় নিঃশেষিত হইয়াছে। কিন্তু নানা কারণে বইখানির এই তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ করিতে বিলম্ব হইল।

আমি দীর্ঘকাল মধুসূদনের কাব্য লইয়া অধ্যাপনা করিতেছি। ইহাতে মধুসূদনের কবি-প্রতিভা সম্পর্কে অনেক নূতন চিন্তার উদয় হইয়াছে, অনেক স্থলে কবির কাব্যের নূতন তাৎপর্য আমার কাছে ধরা পড়িয়াছে। সে সকল এবারকার এই সংস্করণে দেওয়া হইয়াছে। কাজেই, বর্তমান সংস্করণটি ইহার পূর্ববর্তী সংস্করণের পুনর্মুদ্রণ মাত্র নহে। ইহা আগাগোড়াই নূতন করিয়া লিখিত হইয়াছে। ইহাতে কয়েকটি নূতন পরিচ্ছেদও সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে।

যে-কবি বাংলা কাব্যের আধুনিক যুগের উন্মেষ করিয়া দিয়া গিয়াছেন, বর্তমান সংস্করণে তাঁহাকে নূতন দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া বিচার করার যে চেষ্টা আমি করিয়াছি, তাহা ফলবতী হইয়াছে কি না, সুধী কাব্যরসিক ব্যক্তিগণ তাহার বিচার করিবেন।

স্কটিশ চার্চ কলেজ,
কলিকাতা :
জন্মাষ্টমী, ১৩৫৩।

—গ্রন্থকার

সূচীপত্র

মধুসূদন ও বাংলা কাব্যের নবযুগ

বাংলা কাব্যসাহিত্যে মধুসূদন এক যুগান্তকারী প্রতিভা। তিনিই বাংলা কাব্যসাহিত্যকে আধুনিকতায় দীক্ষা দিয়াছিলেন। তাঁহার কাব্যসৃষ্টির কাল হইতেই বাংলা কাব্যসাহিত্য সম্পূর্ণ নূতন এক পথ ধরিয়া অগ্রসর হইয়াছিল; নব নব ভাব, কল্পনা, ছন্দ ও রচনাভঙ্গি বাংলা কাব্যসৃষ্টির ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হইয়াছিল।

মধুসূদনের মধ্যে সর্বসংস্কারবন্ধনমুক্তির একটা দুর্ধর্ষ বিদ্রোহ এবং সৃষ্টিধর্মী আত্মার উল্লাস বর্তমান ছিল। উহারই স্রোতোবেগে তিনি একদিকে পয়ার-বন্ধনে আবদ্ধ বাংলা ছন্দ ও ভাষার দুর্বলপ্রাণ সঙ্কীর্ণ-তট, অন্যদিকে মধ্যযুগীয় সংস্কারে আচ্ছন্ন উপাখ্যানকাব্য প্রভৃতিতে পর্যবসিত ক্ষুদ্রায়তন ভাবতট—দুইই অতিক্রম করিয়া যে শ্রেণীর কাব্য রচনা করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার সৃষ্টি উহার পূর্ববর্তী কাব্য বা কবিতার ভাব ভাষা ছন্দ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক হইয়া উঠিতে পারিয়াছিল। তাঁহার আবির্ভাবের পর হইতেই মঙ্গলকাব্যগত দেবদেবীর বর্ণনার পরিবর্তে মানবপ্রীতি ও মানবমহিমা-গান বাংলা কাব্যের বিষয়বস্তু হইয়া উঠিল। রাবণ, মেঘনাদ, প্রমীলা, মন্দোদরী, সীতা, লক্ষ্মণ প্রভৃতির মধ্য দিয়া কবি মানবমহিমারই কীর্তন করিয়াছেন। তাঁহার কাব্যে কবির ব্যক্তিগত ভাবনা-কল্পনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা ও আদর্শ স্পন্দিত হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার মেঘনাদবধ কাব্য, ব্রজাঙ্গনা, বীরাঙ্গনা ও চতুর্দশপদী কবিতাবলী—সমস্ত সৃষ্টির মধ্যেই, ইংরাজিতে যাহাকে বলে Romantic self-identification তাহাই হইয়াছে।

এই আত্মভাবপ্রাধান্য আধুনিক কবিতার একটি বিশিষ্ট লক্ষণ। এই স্বানুভাবাত্মক কল্পনার প্রকাশই আধুনিক কাব্যকে মধ্যযুগীয় কাব্য হইতে পৃথক করিয়াছে। মধ্যযুগে কাব্য রচনার যে রীতি ছিল, তাহাতে আত্ম-প্রকাশের তেমন সুবিধা ছিল না। সে যুগে কবিগণ পুরাণ প্রভৃতি হইতে তাঁহাদের কাব্যের উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছেন এবং তাঁহাদের সৃষ্টি মুখ্যত আত্মনিরপেক্ষই হইয়াছে। কিন্তু একালের কাব্য আত্মনিষ্ঠ। রবীন্দ্রনাথ

তাঁহার 'জীবনদেবতা' কবিতায় একালের কাব্যরচনার আদর্শ সম্বন্ধে সুস্পষ্ট নির্দেশ রাখিয়া গিয়াছেন।—

গলায়ে গলায়ে বাসনার সোনা
প্রতিদিন আমি করেছি রচনা
তোমার ক্ষণিক খেলার লাগিয়া মূরতি নিত্য নব।

পূর্বসূরী মধুসূদনও কাব্য রচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া ঐ একই আদর্শেরই অনুসরণ করিয়াছিলেন। তিনিও তাঁহার অন্তর্লোকের পুঞ্জীভূত 'বাসনার সোনা'কেই তাঁহার সকল কাব্যে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।

মধুসূদনের কাব্যের উপকরণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পুরাণ হইতে—রামায়ণ, মহাভারত হইতে—সমাহৃত হইলেও, তাঁহার কাব্যসমূহে যুগধর্ম অনুসারে আত্মভাবপ্রাধান্যই ঘটিয়াছে। তাঁহার কাব্যে বিষয়বস্তুর অবলম্বনে কবিচিত্তেরই বিচিত্র বিকাশ দেখা গিয়াছে।

বাংলা কাব্যসাহিত্যের পুষ্টি ও পরিণতিসাধনে মধুসূদনের দান যে কতখানি, তাহা সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি করিতে হইলে বাংলা সাহিত্যের কিরূপ অবস্থায় মধুসূদনের আবির্ভাব হইয়াছিল, তাহা বুঝা নিতান্ত প্রয়োজন।

মধুসূদনের আবির্ভাবের ঠিক পূর্ববর্তী কাল বাংলা সাহিত্যের এক যুগসন্ধিকাল। এই যুগসন্ধিকাল হইতেছে—ভারতচন্দ্র-রামপ্রসাদের পরবর্তী এবং মধুসূদনের আবির্ভাবের পূর্ববর্তী যুগ। ভারতচন্দ্রের তিরোধান হয় ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে, আর কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের তিরোধান হয় ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে। এই সময়ের মধ্যে এক ঈশ্বর গুপ্তের কবিতাবলী ছাড়িয়া দিলে বাংলা সাহিত্যে প্রথম শ্রেণীর কোন কবিরই আবির্ভাব হয় নাই। এই যুগে অবশ্য গীতিকবিতা রচিত হইয়াছিল এবং তাহার পরিমাণও সামান্য নয়। কিন্তু সে সকল গীতিকবিতার মধ্যে ভাবের গাঢ়তা এবং গঠনের পারিপাট্য ছিল না। আমরা কবিওয়ালাদিগের গান, টপ্পা-রচয়িতাদিগের সঙ্গীতাবলী এবং পাঁচালীকার প্রভৃতির কথা বলিতেছি। ইঁহাদের গীতিগুলি প্রায় একশত বৎসর ধরিয়া বাংলার জনসাধারণের চিত্তবিনোদন করিয়াছিল। ইঁহাদের সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলিয়া গিয়াছেন—

এই কবির গান এক সময়ে বঙ্গসাহিত্যের স্বল্পকালস্থায়ী গোধূলি আকাশে অকস্মাৎ দেখা দিয়াছিল; তৎপূর্বেও তাহাদের কোনো পরিচয় ছিল না, এখনও তাহাদের কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া যায় না।

এই সকল গানের ভাষা, ছন্দ, রাগিণী কৃত্রিম। মধ্যযুগের বৈষ্ণব কবিতায়, অথবা মুকুন্দরাম, ভারতচন্দ্রের রচনায় যে পারিপাট্যের পরিচয় আমরা পাইয়াছি, তাহার একান্ত অভাব এই সকল গীতিকবিতায়। ইহার ক বিশ্লেষণ করিয়া রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—

> পূর্বকালের গানগুলি, হয় দেবতার সম্মুখে, নয় রাজার সম্মুখে গীত হইত—সুতরাং স্বতই কবির আদর্শ অত্যন্ত দুরূহ ছিল। সেইজন্য রচনার কোন অংশেই অবহেলার লক্ষণ ছিল না, তার ভাষা, ছন্দ, রাগিণী সকলেরই মধ্যে সৌন্দর্য এবং নৈপুণ্য ছিল। তখন, কবির রচনা করিবার এবং শ্রোতৃগণের শ্রবণ করিবার অব্যাহত অবসর ছিল। তখন গুণিসভায় গুণাকর কবির গুণপণা প্রকাশ সার্থক হইত।
>
> কিন্তু ইংরাজের নূতনসৃষ্ট রাজধানীতে পুরাতন রাজসভা ছিল না, পুরাতন আদর্শ ছিল না। তখন, কবির আশ্রয়দাতা রাজা হইল সর্বসাধারণ নামক এক অপরিণত স্থূলায়তন ব্যক্তি এবং সেই হঠাৎ রাজার সভায় উপযুক্ত গান হইল কবির দলের গান। তখন যথার্থ সাহিত্যরস আলোচনার অবসর যোগ্যতা এবং ইচ্ছা কয়জনের ছিল? তখন নূতন রাজধানীর নূতন সমৃদ্ধিশালী কর্মক্লান্ত বণিক-সম্প্রদায় সন্ধ্যাবেলার বৈঠকে বসিয়া দুই দণ্ডের আমোদ-উত্তেজনা চাহিত। তাহারা সাহিত্যরস চাহিত না।

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার এই উক্তি বিশেষভাবে কবিগান-রচয়িতাদের সম্পর্কে করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের এই উক্তি কেবল যে বাংলা সাহিত্যের যুগসন্ধিকালে আবির্ভূত কবিগান-রচয়িতাদিগের প্রতিই প্রযোজ্য, তাহা নহে। কবিগান, টপ্পা এবং পাঁচালী রচয়িতা—সকলের সম্বন্ধেই উল্লিখিত মন্তব্য প্রযোজ্য।

বাংলা কবিতা কৃত্রিম সহায়তা গ্রহণ করিয়া তখন আপাতমধুর হইয়া উঠিয়াছিল। তখন কাব্যক্ষেত্রে ভাব বা বিষয়ের চেয়ে রূপই প্রধান হইয়াছিল, কবিগণ প্রকাশমাধুর্যের প্রতিই বেশী আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে একমাত্র ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত বাংলার পাঠকসমাজে কতকটা নূতন ধরণের কাব্যরস পরিবেশন করিতেছিলেন।

সে যুগে পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের প্রভাব, পাশ্চাত্ত্য দর্শন ইত্যাদির প্রভাব বাঙ্গালীর চিত্তদেশে একটা রীতিমত আলোড়ন আনিয়াছিল। তখন সমাজ, ধর্ম, রাজনীতি সমস্ত দিকেই একটা পরিবর্তন পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হইতেছিল। নূতন শিক্ষা ও সভ্যতার সহিত, নূতন এক সাহিত্যের সহিত পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালীর পুরাতন রুচির পরিবর্তন হইতেছিল। বাঙ্গালীর মনে নূতন আশা-আকাঙ্ক্ষার উদয় হইয়া তাহাদিগকে নূতন উৎসাহে নূতন কল্পনাভাবনায় উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিতেছিল। বাঙ্গালীর সম্মুখে তখন নূতন কল্পনাজগতের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইয়াছিল।

এই যুগে রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং অক্ষয়কুমার দত্ত আবির্ভূত হইলেন। ইঁহাদের প্রচেষ্টায় বাংলা গদ্যসাহিত্য শক্তিশালিনী ও সজীব ভাবধারার বাহন হইয়া উঠিল। পাশ্চাত্ত্য প্রণালীতে ও পাশ্চাত্ত্য ভাবে বাংলা গদ্য তখন সঞ্জীবিত অনুপ্রাণিত হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু তখন পর্যন্ত বাংলা কাব্যসাহিত্যের কোন উল্লেখযোগ্য সংস্কার সাধিত হয় নাই। পাশ্চাত্ত্য কবিদিগের অনুসৃত আদর্শ, অথবা পাশ্চাত্ত্য কাব্যসাহিত্যের অভ্যন্তরে যে রসধারা প্রবাহিত সেই সৌন্দর্য বাংলা সাহিত্যে প্রবাহিত করাইয়া দিবার জন্য বাংলায় তখনও কোন প্রতিভাশালী কবির আবির্ভাব হয় নাই।

যে যুগে বাংলা গদ্যের যুগান্তকারী পরিবর্তন ও সংস্কারসাধন আরম্ভ হইয়া গিয়াছে, ঠিক সেই যুগে বাংলা সাহিত্যের পদ্য-বিভাগে গুপ্তযুগ। গুপ্ত কবির প্রভাব বাংলা সাহিত্যের উপর তখন অপ্রতিহত। ভারতচন্দ্র এবং তাঁহার অনুসরণকারী তৎপরবর্তী যুগের কবিগণ আদিরসের প্লাবনে বাংলা সাহিত্যকে পঙ্কিল করিয়া তুলিয়াছিলেন; ঈশ্বর গুপ্ত তাঁহার কবিতার মধ্য দিয়া হাস্যরস পরিবেশন করিয়া বাংলার পাঠক সমাজের সেই বিকৃত রুচি পরিবর্তন করিতে পারিয়াছিলেন। তিনি ছিলেন সে যুগের ইংরাজি ভাষায় অনভিজ্ঞ মধ্যবয়স্ক এবং প্রাচীন সম্প্রদায়ের কাব্যজগতের একচ্ছত্র সম্রাট্। এমন কি অপেক্ষাকৃত নব্যবয়স্ক এবং ইংরাজি শিক্ষিতগণও তাঁহার কবিতার পক্ষপাতী ছিলেন। কারণ, তাঁহার কবিতা একেবারে পাশ্চাত্ত্য প্রভাব বর্জিত ছিল না। তাছাড়া, তাঁহার কবিতার মধ্য দিয়া যে শ্লেষ-ব্যঙ্গ এবং realism বা বাস্তবতা উৎসারিত হইয়াছিল, তাহা ইংরাজি ভাষায়

অনভিজ্ঞ প্রাচীন এবং ইংরাজি-শিক্ষিত নবীন—এই উভয় সম্প্রদায়কেই বিশেষভাবে মুগ্ধ করিয়াছিল।

কিন্তু শত হইলেও ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিতা সেই নবযুগের ইংরাজি-শিক্ষিত পাশ্চাত্ত্যকাব্যরসপিপাসু-সম্প্রদায়ের সম্পূর্ণ মনস্তুষ্টি সাধন করিতে অসমর্থ ছিল। ভারতচন্দ্রের পরবর্তী কালে বাংলা কাব্যসাহিত্যে যে আদিরসের প্লাবন বহিয়াছিল, গুপ্ত কবির কবিতার হাস্যরসাত্মক realism তাহার মূলোৎপাটন করিয়াছিল সত্য। কিন্তু গুপ্ত কবির কবিতা একেবারে ভারতচন্দ্রীয় যুগের কাব্যসাহিত্যের প্রভাববর্জিত ছিল না। বিশুদ্ধ রুচির অভাবে, যমকানুপ্রাসের প্রাচুর্যে আর স্থানে স্থানে অর্থহীন শব্দবিন্যাসের জন্য তাঁহার কবিতা ঐ যুগের শিক্ষিত নব্যসম্প্রদায়ের মনস্তুষ্টি করিতে পারে নাই।

সে যুগে যুবকগণ পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া পাশ্চাত্ত্যকাব্যরসপিপাসু হইয়া উঠিয়াছিল। পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের ভাব-কল্পনা এবং ছন্দের ঐশ্বর্য ও বৈচিত্র্য সে যুগের শিক্ষিত যুবক সম্প্রদায়কে বিস্মিত ও বিমূঢ় করিয়া দিয়াছিল। পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের ঐশ্বর্য-সমৃদ্ধির তুলনায় বাংলা সাহিত্যের দৈন্য তাঁহাদের চোখে বড় বেশী করিয়া ঠেকিতেছিল। কাজেই ভারতচন্দ্র অথবা ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিতা নবযুগের নবীন যুব-সম্প্রদায়ের আর মনোরঞ্জন করিতে পারিতেছিল না। পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের ভিতরে যে ধরণের কবি-দৃষ্টি ও কলানৈপুণ্য আছে, বাংলা সাহিত্যের ভিতরে তাহাকে প্রবর্তিত করা সেই নবযুগের সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

বঙ্গসাহিত্যের এই অবস্থাসঙ্কটে—সেই নবযুগের সমস্যা মিটাইবার জন্য এই সময় দুইজন পাশ্চাত্ত্য-শিক্ষায় শিক্ষিত কবির আবির্ভাব হয়। একজন কবিবর রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়—অপরজন মাইকেল মধুসূদন দত্ত। উভয়ে সমসাময়িক কবি, উভয়েই উভয়ের বন্ধু। কিন্তু সাহিত্যজগতে মধুসূদনের পূর্বে রঙ্গলালের কার্য আরব্ধ হইয়াছিল। ইঁহার প্রথম কাব্য 'পদ্মিনী-উপাখ্যান' প্রকাশিত হয় ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে—অর্থাৎ ঈশ্বর গুপ্তের তিরোধান হয় যে বৎসরে সেই বৎসর। রঙ্গলাল যুগসমস্যা উপলব্ধি করিয়া যুগপ্রয়োজন মিটাইবার জন্য কাব্যরচনায় প্রবৃত্ত হন। এ সম্বন্ধে তিনি তাঁহার কাব্যগ্রন্থ পদ্মিনী-উপাখ্যানের ভূমিকায় যাহা বলিয়া গিয়াছেন তাহা এখানে প্রণিধান-যোগ্য।—

আমি সর্বাপেক্ষা ইংলণ্ডীয় কবিতার সমধিক পর্যালোচনা করিয়াছি এবং সেই বিশুদ্ধ প্রণালীতে বঙ্গীয় কবিতা রচনা করা আমার বহুদিনের অভ্যাস। বাঙ্গালা সমাচার পত্রপুঞ্জে আমি চতুর্দশ ও পঞ্চদশ বর্ষ বয়সেই উক্ত প্রকার পদ্য প্রকটন করিতে আরম্ভ করি। উপস্থিত কাব্যের স্থানে স্থানে অনেকানেক ইংলণ্ডীয় কবিতার ভাবাকর্ষণ আছে। আমি ইচ্ছাপূর্বকই অনেক মনোহর ভাব স্বীয় ভাষায় প্রকাশ করণে চেষ্টা পাইয়াছি।··· ইংলণ্ডীয় বিশুদ্ধ প্রণালীতে যত বঙ্গীয় কাব্য বিরচিত হইবে, ততই ব্রীড়াশূন্য কদর্য কবিতা-কলাপ অন্তর্ধান করিতে থাকিবে।

রঙ্গলাল যুগ-প্রয়োজন উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে সেই নবযুগের কাব্যসাহিত্য পাশ্চাত্ত্য ভাবাদর্শ অনুযায়ী রচিত হওয়া প্রয়োজন। ভারতচন্দ্রের পরে বাংলা কাব্যসাহিত্যে যে 'ব্রীড়াশূন্য কদর্য কবিতা-কলাপ' আরম্ভ হইয়াছিল, রঙ্গলালই বাংলা কাব্যসাহিত্যক্ষেত্র হইতে সর্বপ্রথম তাহাকে দূরীভূত করিবার জন্য ব্রতী হইয়াছিলেন। এ বিষয়ে ঈশ্বর গুপ্ত অপেক্ষা রঙ্গলালের কৃতিত্ব অধিকতর। তিনিই সাহিত্যে নির্মল কিরণপাত করিয়া বাংলা কাব্যসাহিত্যে শুচিতা আনয়ন করিয়াছিলেন। ভাবের পরিচ্ছন্নতা ও বিষয়বস্তুর গৌরব—দুই বিষয়েই তিনি বঙ্গসাহিত্যের এই নবযুগের অগ্রদূত। যে স্বাদেশিকতা আধুনিকতার লক্ষণ—তাঁহার কাব্যে তাহাও উৎসারিত হইয়াছে। কাব্যের বিষয়বস্তু নিরূপণে অলৌকিক পৌরাণিক কাহিনীসমূহ মন্থন না করিয়া, তিনি রাজপুতানার স্বাধীনতার কাহিনী অবলম্বন করিয়াছিলেন। সেই হেতু তাঁহার কাব্যের ভিতর দিয়া স্বদেশপ্রেম ও বীরত্বপ্রশংসা বিঘোষিত হইয়াছে।/ তাঁহার 'শূরসুন্দরী' কাব্যে ইউরোপীয় কবিগণের অনুরূপ Muse-এর বন্দনা বা 'কবিতা-শক্তির প্রতি' কবির নিবেদন আমরা পাইয়াছি। পাশ্চাত্ত্য কাব্যাদর্শ অনুযায়ী বর্ণনাভঙ্গি রঙ্গলালে আছে—তুলনা উপমা প্রভৃতির প্রয়োগে তিনি ভারতীয় সাহিত্যের গতানুগতিক আদর্শ পরিত্যাগ করিয়াছেন—নূতন ধরণের উপমা প্রভৃতির প্রয়োগ করিয়াছেন। সেক্সপীয়ার, স্কট, বায়রন প্রভৃতি ইংরাজ কবিগণের ভাব উপমা ইত্যাদি তাঁহার কাব্যে আহৃত হইয়াছে। তাঁহার 'কর্মদেবী'তে Scott-এর Lay of the Last Minstrel-এর ছায়া পড়িয়াছে, তাঁহার 'শূরসুন্দরী'তে স্কট বায়রনের প্রভাব রহিয়াছে। সেক্সপীয়ারের কাব্যের অনেক উৎকৃষ্ট অংশের তর্জমা তাঁহাব 'পদ্মিনী উপাখ্যানে' আছে।

কিন্তু রঙ্গলালের কাব্যসমূহে উল্লিখিত গুণসমূহ—বিশেষতঃ পাশ্চাত্ত্য-প্রভাব থাকিলেও—সেগুলি ইংরাজি শিক্ষায় শিক্ষিতগণকে ঠিক আকৃষ্ট করিতে পারে নাই। উহাদের মধ্যে এমন আকর্ষণী শক্তি ছিল না, যাহাতে ইংরাজি-কাব্যরসপিপাসু ব্যক্তিগণ তাঁহার কাব্য পাঠ করিয়া পরিপূর্ণভাবে পরিতৃপ্ত বা মুগ্ধ হইতে পারেন। তাঁহার রচনায় বিষয়গৌরব ছিল, ইংরাজি প্রভাব ছিল, শুচিতা ছিল, নূতন সৃষ্টির আবেগ ছিল। তথাপি তিনি বাংলা কাব্যসাহিত্যকে পুনরুজ্জীবিত করিয়া তুলিবার যে কামনা মনোমধ্যে পোষণ করিয়া 'পদ্মিনী উপাখ্যানে'র ভূমিকা রচনা করিয়াছিলেন, তাঁহার সে কামনা সার্থক হয় নাই। রঙ্গলালের উদ্দেশ্য ছিল Scott, Byron ও Moore-এর কাহিনীকাব্যের আদর্শে কাব্য রচনা করা। তাঁহার কাব্য বিষয়বস্তুতে Scott, Moore এবং Byron-এর Metrical Romance-এর সমশ্রেণীর হইয়াছিল বটে। কিন্তু তাহার Form হইয়াছিল মঙ্গলকাব্যের ন্যায়। ইংরাজি Verse Tale-এর মধ্যে যে Romantic ভাব আছে, যাহার জন্য এই শ্রেণীর কাব্যের বৈশিষ্ট্য বা উপাদেয়তা, উহা তিনি তাঁহার উপাখ্যান-কাব্যসমূহে সঞ্চারিত করিতে পারেন নাই। Verse Tale-এর মধ্যে যে ধরণের কবিদৃষ্টি ও কল্পনানৈপুণ্য আছে, তাহা তিনি তাঁহার রচিত উপাখ্যানকাব্যে ফুটাইতে সমর্থ হন নাই। তিনি ভারতচন্দ্রীয় যুগের ভাবের সংস্কারকর্তা ছিলেন বটে, কিন্তু ভারতচন্দ্রের ভাষার মাধুর্য এবং ধ্বনি-লাবণ্য তাঁহার কাব্যে একান্ত অভাব। ভারতচন্দ্রের ভাষা মার্জিত, পরিচ্ছন্ন—কিন্তু রঙ্গলালের ভাষা মাধুর্যবিহীন। অপ্রয়োজনে তিনি অপ্রচলিত শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার কাব্যের ভাষায় melody-র অভাব ঘটিয়াছে। পরবর্তীকালে হেম নবীনের ভাষায় যে গতিবেগ আছে, রঙ্গলালের 'পদ্মিনী উপাখ্যানে' তাহা নাই। তাঁহার কাব্যে ইংরাজ কবি সেক্সপীয়ার, বায়রন প্রভৃতির কাব্যের অংশ-বিশেষের তর্জমা আছে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে সেই সব তর্জমা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইয়াছে—মূলের মাধুর্য তাহারা হারাইয়াছে।

সুতরাং যুগসমস্যা উপলব্ধি করিয়া সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেও রঙ্গলাল সম্পূর্ণভাবে যুগসমস্যার সমাধান করিতে পারিলেন না,—সাহিত্য-জগতে যে পরিবর্তন বা সংস্কার প্রয়োজন ছিল, রঙ্গলাল তাহা সাধন করিতে

অকৃতকার্য হইলেন। কাব্যের আদর্শে বা কবি-কল্পনায় কোন আমূল পরিবর্তন রঙ্গলালে পরিলক্ষিত হইল না।

ঠিক এই সময়েই মধুসূদনের প্রতিভার বিকাশ ঘটিল। রঙ্গলাল ও মধুসূদনের কাব্য-সাধনা প্রায় একই যুগে আরম্ভ হইলেও, বাংলার সাহিত্যক্ষেত্রে মধুসূদনের প্রতিভাদীপ্ত দান রঙ্গলাল অপেক্ষা সুদূরপ্রসারী হইয়াছিল। কারণ পাশ্চাত্ত্য কাব্যসাহিত্যের ভাব-কল্পনাকে আত্মসাৎ করার এবং আপন মাতৃভাষায় উহাকে সার্থকভাবে ব্যবহার করার বা প্রকাশ করার ক্ষমতা মধুসূদনের যতখানি ছিল, রঙ্গলালের ততখানি ছিল না।

হিন্দু কলেজে এবং বিশপস কলেজে অধ্যয়নকালে মধুসূদন হিব্রু, লাটিন, গ্রীক প্রভৃতি পাশ্চাত্ত্য ভাষার অনুশীলন করিয়াছিলেন। সংস্কৃত ভাষার অনুশীলনও তিনি করিয়াছিলেন। ঐ সকল ভাষার মহাকবিগণের কাব্যের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় হইয়াছিল। তারপর যখন ঘটনাচক্রে চালিত হইয়া তিনি প্রথমে নাটক ও পরে কাব্যরচনায় প্রবৃত্ত হইলেন, তখন দেখা গেল, পাশ্চাত্ত্য কাব্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদ্ তাঁহার সৃষ্টির মধ্যে সমাহৃত। দেখা গেল যে, তাঁহার সৃষ্টির ফলে বাংলা সাহিত্যের গতি ভিন্নমুখী হইয়াছে, বাংলা কাব্যের প্রকৃতি বদলাইয়া গিয়াছে।

বিদেশী কাব্যের সম্পদ্ আহরণ করিয়া বঙ্গসাহিত্যে তিনি নূতন আকর্ষণী শক্তি সঞ্চার করিলেন। গাম্ভীর্যে ও ভাববৈচিত্র্যে বাংলা সাহিত্য সেই প্রথম সমৃদ্ধ হইয়া উঠিল। মিলটনের উদাত্ত গম্ভীর ছন্দধ্বনি তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়াছিল। ভার্জিলের শব্দসম্পদ্ তাঁহার মধ্যে আপন মাতৃভাষার শব্দ-সম্পদ্ বর্ধিত করার আকাঙ্ক্ষা জাগাইয়াছিল। কালিদাসের সৌন্দর্যকল্পনা তাঁহাকে প্রভাবিত করিয়াছিল, বিশ্বপ্রকৃতির সহিত মানবপ্রকৃতির যে সম্বন্ধবোধ কালিদাসের শকুন্তলায় ও ভবভূতির উত্তররামচরিতে ছিল তাহা তাঁহার কল্পনার উৎসমূলে প্রেরণা জোগাইয়াছিল। সুতরাং কবি যখন কাব্যসৃষ্টিতে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন বাংলা সাহিত্য এক নূতন পথ ধরিয়া অগ্রসর হইয়া চলিল। তিনিই প্রথমে দেখাইলেন বাংলা ভাষার প্রকাশ ক্ষমতা। দেখাইলেন, বাংলা কাব্যে কেবল বাঁশীর মৃদুমধুর গুঞ্জনধ্বনি অথবা বেণুবীণানিক্কণ ধ্বনিত হয় না। প্রতিভাশালী কবি এ ভাষায় ভেরীর সুগম্ভীর রবও প্রকাশ করিতে সমর্থ।

তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য

বাংলা কাব্যসাহিত্যে মধুসূদনের প্রথম দান তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য। ইহা মধুসূদনের প্রথম কাব্য বটে, কিন্তু কবির প্রতিভার স্ফুরণ হয় নাটক রচনার মধ্য দিয়া। তাঁহার প্রথম নাটক শর্মিষ্ঠা প্রকাশিত হয় ১৮৫৮ সালে এবং ঐ বৎসরই উহা বেলগাছিয়া নাট্যশালায় অভিনীত হয়। শর্মিষ্ঠাই মধুসূদনের প্রথম উল্লেখযোগ্য বাংলা রচনা; ইহার পূর্বে তিনি কেবল ইংরাজিতেই কাব্যরচনা করিয়াছিলেন। দুই-একটি বাংলা কবিতা যাহা রচনা করিয়াছিলেন, তাহাতে কাঁচা হাতের ছাপ ছিল।

মধুসূদন তাঁহার সৌভাগ্যক্রমে বেলগাছিয়া নাট্যশালার সংস্পর্শে আসেন এবং এই নাট্যশালার কর্তৃপক্ষগণের অনুরোধে শর্মিষ্ঠা নাটকখানি রচনা করিয়া সকলকে বিস্মিত করিয়া দেন। এই নাটকে পুরাতনের পুনরাবৃত্তি ছিল না, ইহার মধ্যে বাংলার নাট্যসাহিত্যকে সম্পূর্ণ নূতন পথে পরিচালিত করিবার সঙ্কল্প প্রকাশ পাইয়াছিল।

মধুসূদন বাংলা সাহিত্যের প্রথম নাট্যকার নহেন। তাঁহার পূর্বে রামনারায়ণ তর্করত্ন প্রভৃতির সংস্কৃত রীতি অনুযায়ী রচিত নাটক বাংলার রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইতেছিল। নান্দী-প্রস্তাবনা যুক্ত, উপমা-অনুপ্রাস পরিপূর্ণ উক্তি-সমন্বিত ঐ সকল নাটক সে যুগের ইংরাজিশিক্ষিত পাঠকগোষ্ঠীর চিত্তবিনোদ করিতে পারিতেছিল না। স্কট, বায়রন, মুর ইত্যাদির কাব্য-পাঠে অভ্যস্ত, অথবা বেন জনসন, সেক্সপীয়ারের নাট্যসাহিত্যের সহিত পরিচিত বাংলার শিক্ষিত সম্প্রদায় পাশ্চাত্ত্য কাব্যনাটকাদির এমন এক বিশিষ্ট গঠনভঙ্গি ও ভাব-কল্পনার সমৃদ্ধির সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন যে, তাঁহারা বাংলা কাব্যনাটকের দৈন্য দেখিয়া মাতৃভাষার সাহিত্যকে উপেক্ষা-অনাদর করিতেছিলেন। মধুসূদন নাটক রচনা করিয়া ইঁহাদের রসপিপাসা মিটাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

কিন্তু শুধু এই নবীন পাঠকগোষ্ঠীর রসপিপাসা মিটান নয়, নাটকরচনার দ্বারাই মধুসূদন তাঁহার কাব্যসৃষ্টির একটা সুস্পষ্ট আদর্শের

সন্ধানও পাইয়াছিলেন। এই জন্যই মধুসূদনের নাটকরচনার প্রয়াস তাঁহার কবিজীবনেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শর্মিষ্ঠা নাটক রচনার পর মধুসূদন দুইখানি পত্র লিখিয়াছিলেন, ঐ পত্র দুইখানি হইতে কেবল তাঁহার নাটকরচনার আদর্শ নহে,—তাঁহার কাব্যরচনার আদর্শ সম্বন্ধেও একটা স্পষ্ট ধারণা আমরা করিয়া লইতে পারি। একটি পত্রে তিনি লিখিয়াছিলেন,—

"Remember that I am writing for that portion of my countrymen who think as I think, whose minds have been more or less imbued with western ideas and modes of thinking ; and that it is my intention to throw off the fetters forged for us by a servile imitation of everything Sanskrit."

অন্য আর একটি পত্র এইরূপ—

"If I should live to write other dramas, you may rest assured, I shall not allow myself to be bound by the dicta of Viswanath of the Sahitya Darpan. I shall look to the great dramatists of Europe for models."

এই যে আকাঙ্ক্ষা,—এই "to throw off the fetters forged for us by a servile imitation of everything Sanskrit", এবং "I shall look to the great dramatists of Europe for models"—ইহারই ফলে মধুসূদন নূতন যুগের উপযোগী নাটক রচনায় সমর্থ হইয়াছিলেন, নূতন রীতির ও নূতন ভাবকল্পনাসমৃদ্ধ কাব্যরচনায় তিনি সমর্থ হইয়াছিলেন। কাব্যসৃষ্টির পথের সন্ধান, আদর্শের আভাস এবং আপন সৃজনীপ্রতিভার সাক্ষাৎকার নাটকরচনার মধ্য দিয়াই মধুসূদনের ঘটিয়াছিল। উহাই বাংলা কাব্যের রীতি-প্রকৃতির আমূল পরিবর্তনসাধনে সহায়তা করিয়াছিল।

শর্মি ার পরেই মধুসূদন তাঁহার পদ্মাবতী নাটকখানি রচনা করেন। ইহাও তাঁহার প্রথম নাটকের মতই পাশ্চাত্ত্য আদর্শে অনুপ্রাণিত অভিনব সৃষ্টি। নাটকখানিতে গ্রীক পুরাণের ছায়া বর্তমান—এই নাটকে অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রথম প্রয়োগ।

অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রবর্তন ও উহার সৌন্দর্যসাধন বঙ্গসাহিত্যে

মধুস্থদনের অন্যতম কীর্তি। যেভাবে মধুস্থদন বঙ্গসাহিত্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রবর্তনে প্রণোদিত হইয়াছিলেন এখানে তাহার উল্লেখ করা যাইতে পারে। বেলগাছিয়া নাট্যশালার সংস্পর্শে আসিয়া মধুস্থদন সে যুগের কয়েকজন সাহিত্যরসিকের সহিত পরিচিত হন। ইঁহারা হইতেছেন,—রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ, রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ এবং মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর। একদিন মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সহিত কথোপকথন-প্রসঙ্গে বাংলা নাটকে অমিত্রাক্ষর ছন্দের ব্যবহার সম্পর্কে কথা উঠিল। মধুস্থদন তাঁহার শর্মিষ্ঠা নাটক রচনাকালেই উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, মুক্ত অমিত্রাক্ষর ছন্দের ব্যবহার ব্যতীত বাংলা নাটকের উন্নতি নাই। কাজেই পাশ্চাত্ত্যের ঐ ছন্দ-সম্পর্কে কথা উঠিলে, মধুস্থদন বাংলা নাটকে ঐ ছন্দের উপযোগিতা সম্বন্ধে মন্তব্য করিলেন। ইহাতে মহারাজা যতীন্দ্রমোহন বলিলেন,—বাংলা ভাষার যেরূপ অপরিণত অবস্থা, তাহাতে এই ভাষায় অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রবর্তিত হওয়ার সম্ভাবনা অল্প। মধুস্থদন কিন্তু মহারাজা যতীন্দ্রমোহনের মন্তব্য স্বীকার করিয়া লইতে পারিলেন না,—বাংলা ভাষায় অমিত্রছন্দ ব্যবহারের অসম্ভাব্যতা তিনি মানিয়া লইলেন না, বরং নিজে ঐ ছন্দে রচনার সঙ্কল্প তিনি মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের কাছে প্রকাশ করিলেন। কবির সেই সঙ্কল্প প্রথমে রূপলাভ করিল পদ্মাবতী নাটকে, তারপর তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যে। পাশ্চাত্ত্যের কাব্যনাটক অনুশীলন করিয়া অমিত্রাক্ষর ছন্দের গঠনপ্রণালী ও প্রকৃতির সহিত কবির ঘনিষ্ঠ পরিচয় হইয়াছিল। কাজেই সেদিন আপন শক্তি সম্বন্ধে সচেতন কবির পক্ষে পাশ্চাত্ত্যের মেঘমন্দ্র ছন্দ অমিত্রাক্ষরকে বাংলা ভাষায় প্রবর্তিত করা অসম্ভব হয় নাই।

মধুস্থদনের শর্মিষ্ঠা নাটক পাঠ করিয়া রাজনারায়ণ বসু বলিয়াছিলেন, "Sarmistha is in many places full of sterling poetry."—কথাটি সত্য। মধুস্থদন মুখ্যত কবিই ছিলেন, তাঁহার মন ছিল একান্তভাবেই কল্পনাপ্রবণ। তাই দেখি,—শর্মিষ্ঠা নাটক হইলেও,উহার মধ্য দিয়া কবিত্বই উৎসারিত হইয়াছে। পদ্মাবতীতেও তাহাই হইয়াছে। দুইখানি নাটকই রোমান্টিক, objective বর্ণনা অপেক্ষা subjective কল্পনাই নাটকগুলিতে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। কল্পনার আতিশয্য ও আবেগে তাঁহার নাটকগুলি কাব্যধর্মী হইয়া উঠিয়াছে।

মধুসূদনের নাটকে কবিত্ব থাকিলেও, কবির কল্পনাস্রোত সেখানে অবাধে উৎসারিত হইতে পারে নাই। কোথায় যেন কিসের দ্বারা উহার উৎসমুখ অবরুদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু নাটকের মধ্য দিয়া কবির যে কল্পনাপ্রবণ এবং সৌন্দর্যমুগ্ধ কবিহৃদয় আপনার বিকাশলাভের পথ খুঁজিয়া ফিরিতেছিল, তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যে আত্মপ্রকাশের সেই পথ কবি খুঁজিয়া পাইয়াছিলেন।

তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যে মধুসূদন নিখুঁত সৌন্দর্যতত্ত্বের কবি। এ কাব্যে কবির চিত্ত কীট্‌স্‌ কালিদাসের মত সৌন্দর্যের ভাবরসে বিভোর হইয়া উঠিয়াছে।

সুন্দ উপসুন্দ কর্তৃক স্বর্গজয় এবং তাহাদের বধের জন্য সৌন্দর্যপ্রতিমা তিলোত্তমার সৃষ্টি—এই পৌরাণিক কাহিনীকে কেন্দ্র করিয়া তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য রচিত। কাব্যটি চারিটি সর্গে বিভক্ত। দীর্ঘকাল অসুরগণের সহিত সংগ্রাম করিয়া পরাজিত দেবতাগণ দিগ্বিদিকে পলায়ন করিয়াছেন। ফলে স্বর্গরাজ্য দৈত্যগণের অধিকৃত হইয়াছে। দেবরাজ ইন্দ্র হিমাচলের এক নিভৃত শৃঙ্গে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। অন্যান্য দেবগণ ব্রহ্মলোকে। স্বর্গে অপ্সরা-গণের নৃত্য গীত ও সুমধুর বাদ্যধ্বনি নীরব হইয়া গিয়াছে। দেবলোকের এই বিষাদাচ্ছন্ন বর্ণনার মধ্য দিয়া তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যের আরম্ভ হইয়াছে।

ইন্দ্রের চক্ষে নিদ্রা নাই, কারণ তিনি স্বর্গরাজ্যচ্যুত। রাত্রি হইয়া আসিল, স্বপ্নদেবী ও নিদ্রাদেবী উভয়ে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু তাঁহাদের শত চেষ্টাতেও দেবরাজ ইন্দ্রের নিদ্রা আসিল না। তখন উভয়েই বুঝিতে পারিলেন যে, এ অবস্থায় দেবরাজকে শান্তি দিবার মত ক্ষমতা এক শচীদেবী ভিন্ন অপর কাহারও নাই। স্বপ্নদেবী শচীদেবীকে আহ্বান করিতে গেলেন। শচীদেবীর আবির্ভাবে হিমাচলের চিরতুষারের রাজ্যে অকস্মাৎ বসন্তের সমাগম হইল।

আইলা পৌলোমী সতী মেঘাসনে বসি',
তেজোরাশি বেষ্টিতা ; নাদিল জলধর,
সে গম্ভীর নাদ শুনি' আকাশসম্ভবা
প্রতিধ্বনি সপুলকে বিস্তারিলা তারে
চারিদিকে ; কুঞ্জবন, কন্দর, পর্বত,
নিবিড় কানন, দূর নগর, নগরী,

সে স্বর-তরঙ্গ রঙ্গে পূরিল সবারে।
চাতকিনী জয়ধ্বনি করিয়া উড়িল
শূন্য পথে, হেরি দূরে প্রাণনাথে যথা
বিরহবিধুরা বালা, ধায় তার পানে।
নাচিতে লাগিল মত্ত শিখিনী সুখিনী ;
প্রকাশিল শিখী চারু চন্দ্রক কলাপ ;
বলাকা, মালায় গাঁথা, আইল ত্বরিতে
জুড়িয়া আকাশপথ, সুবর্ণ কদলী—
ফুলকুলবধূ সতী সদা লজ্জাবতী,
মাথা তুলি শূন্যপানে চাহিয়া হাসিল ;
গোপিনী শুনি যেমনি মুরলীর ধ্বনি
চাহে গো নিকুঞ্জ পানে, যবে ব্রজধামে
দাঁড়ায়ে কদম্বমূলে যমুনার কূলে,
মৃদুস্বরে সুন্দরীরে ডাকেন মুরারি।

... ...

উঠিলেন ইন্দ্রপ্রিয়া মৃদু মন্দ গতি।
ধবল শিখরে সতী আচম্বিতে তথা
নয়ন-রঞ্জন এক নিকুঞ্জ শোভিলা—
বিবিধ কুসুমজাল, স্তবকে স্তবকে,
বনরত্ন, মধুর সর্বস্ব, স্মরধন,
বিকশিয়া চারিদিকে হাসিতে লাগিল—
নীলনভস্থলে হাসে তারাদল যথা।
মধুকর-নিকর আনন্দধ্বনি করি'
মকরন্দ-লোভে অন্ধ আসি' উতরিলা,
বসন্তের কলকণ্ঠ গায়ক কোকিল
বরষিলা স্বরসুধা ; মলয় মারুত—
ফুল-কুল-নায়ক-প্রবর সমীরণ—
প্রতি অনুকূল-ফুল-শ্রবণ-কুহরে
প্রেমের রহস্য আসি' কহিতে লাগিল ;

ছুটিল সৌরভ যেন রতির নিঃশ্বাস,
মন্মথের মন যবে মথেন কামিনী
পাতি' প্রণয়ের ফাঁদ প্রণয়কৌতুকে
বিরলে !

শচীদেবীর আবির্ভাবে দেবরাজ ইন্দ্রের মোহ ভঙ্গ হইল—ইন্দ্রদেব ও শচী অতঃপর ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন অন্যান্য দেবতাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য।

এই স্থানে দ্বিতীয় সর্গের আরম্ভ হইয়াছে। দ্বিতীয় সর্গের প্রারম্ভে কবি দেবদম্পতির ব্রহ্মলোকে গমন বর্ণনা করিয়াছেন। ইন্দ্র ব্রহ্মলোকে পৌঁছিলে দেবতাগণ তাঁহার সহিত আসিয়া মিলিত হইলেন এবং উপস্থিত বিপদ হইতে উদ্ধারের উপায় উদ্ভাবন করিবার জন্য পরামর্শ আরম্ভ করিলেন। এই দেবসভায় ইন্দ্র বায়ু যম কার্ত্তিকেয় বরুণ প্রভৃতির মন্ত্রণার ভিতর দিয়া প্রত্যেকটি দেবতার চরিত্র উজ্জ্বলবর্ণে ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই অংশে প্রত্যেকটি দেবতাচরিত্র নিজ নিজ বিশেষত্বে মনোহর।

সকল দেবতার মধ্যে কবি ইন্দ্র-চরিত্র বর্ণনায় বিশেষ নিপুণতার ও নূতন কল্পনাভঙ্গির পরিচয় দিয়াছেন। তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যের ইন্দ্র মহৎ ও উদার। এ কাব্যের ইন্দ্রকে পৌরাণিক ইন্দ্রের হীনতা স্পর্শ করে নাই। পৌরাণিক ইন্দ্র বিলাসী, ইন্দ্রিয়পরায়ণ, স্বার্থপর ও পরশ্রীকাতর। কিন্তু তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যের ইন্দ্র কর্তব্যপরায়ণ, আশ্রিতের প্রতি সহানুভূতিশীল। আশ্রিত দেবতাগণকে রক্ষা করিতে না পারিয়া তিনি অনুতপ্ত। নিজের দুঃখকে তিনি অকিঞ্চিৎকর বলিয়া মনে করেন। ব্রহ্মাকে উদ্দেশ করিয়া তিনি বলিয়াছিলেন—

কিন্তু নহি নিজ দুঃখে দুঃখী,
সৃজন পালন লয় তোমার ইচ্ছায়,
তুমি গড়, তুমি ভাঙ, বজায় রাখহ
তুমি, কিন্তু এই যে অগণ্য দেবগণ
এ সবার দুঃখ, দেব, দেখি' প্রাণ কাঁদে।

দেবরাজ ইন্দ্র দেবতাদিগকে তাঁহাদের বিপদে রক্ষা করিতে পারিতেছেন না। এই অক্ষমতার জন্য তিনি অনুতপ্ত—

হায়রে, দেবেন্দ্র
আমি স্বর্গপতি, মোর আশ্রিত যে জন
রক্ষিতে তাহারে মম না হয় ক্ষমতা!

বায়ু ও যম সৃষ্টি ধ্বংস করিয়া দেবাসুরের সংগ্রাম মিটাইতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য সমগ্র সৃষ্টিধ্বংসের কথা স্মরণ করিয়া ইন্দ্র শিহরিয়া উঠিয়াছিলেন। সৃষ্টিধ্বংসের প্রস্তাবে ইন্দ্রের উদার মন সায় দেয় নাই। তিনি তখন দেবতাগণকে তাঁহাদের মহৎ কর্তব্যের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া বলিয়াছিলেন—

পালিতে এ বিপুল জগৎ,
সৃজন, হে দেবগণ, আমা সবাকার।
অতএব কেমনে যে রক্ষক, সে জন
হইবে ভক্ষক? যথা ধর্ম জয় তথা।
অন্যায় করিতে যদি আরম্ভি আমরা,
সুরাসুরে বিভেদ কি থাকিবেক কহ?

এই সকল উক্তির ভিতর দিয়া ইন্দ্রের মহৎ অন্তঃকরণই আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। মধুসূদনই সর্বপ্রথম পৌরাণিক ইন্দ্র চরিত্রকে উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত করিয়া তাঁহাকে মহৎ ও উদার করিয়া তুলিয়াছেন। মধুসূদনের এই আদর্শ হেমচন্দ্রের বৃত্রসংহার কাব্যে অনুসৃত হইয়াছে—বৃত্রসংহার কাব্যের ইন্দ্রচরিত্রও উজ্জ্বল, উদার ও মহৎ।

নিজেদের মধ্যে নানাপ্রকার পরামর্শ করিয়াও দেবতাগণ যখন তাঁহাদের কর্তব্য নিরূপণ করিতে পারিলেন না, তখন তাঁহারা ব্রহ্মার নিকটে গমন করিলেন। এইখানে দ্বিতীয় সর্গের সমাপ্তি হইয়াছে।

তৃতীয় সর্গে ব্রহ্মপুরীর বর্ণনা। সেখানে উপস্থিত হইয়া দেবগণ ব্রহ্মার স্তব করিলেন। দেবতাদের প্রার্থনায় তুষ্ট হইয়া ব্রহ্মা বলিলেন—

সুন্দ উপসুন্দাসুর দৈব বলে বলী;
কঠোর তপস্যাফলে অজেয় জগতে।
কি অমর কিবা নর সমরে দুর্বার
দোঁহে! ভ্রাতৃভেদ ভিন্ন অন্য পথ নাহি
নিবারিতে এ দানবদ্বয়ে!—

কিন্তু দেবতাগণ কিরূপে ভ্রাতৃভেদ সৃষ্টি করিবেন এই সমস্যায় পড়িলেন। অকস্মাৎ দৈববাণী হইল—

আনি' বিশ্বকর্ম্মায়, হে দেবগণ, গড়
বামায়,—অঙ্গনাকুলে অতুলা জগতে!
ত্রিলোকে আছয়ে যত স্থাবর জঙ্গম
ভূত, তিল তিল সবা হইতে লইয়া,
সৃজ এক প্রমদারে—ভব-প্রমোদিনী!

অতঃপর শিল্পী বিশ্বকর্ম্মাকে আহ্বান করা হইল। তিনি আসিয়া বিশ্বের সকল সৌন্দর্য হইতে তিল তিল আহরণ করিয়া তিলোত্তমার সৃষ্টি করিলেন।

অমৃত সঞ্চারি তবে দেব-শিল্পী-পতি
জীবাইলা কামিনীরে,—সুমোহিনী বেশে
দাঁড়াইয়া প্রভা যেন আহা মূর্তিমতী!

শচীপতি তিলোত্তমাকে লইয়া স্বর্গরাজ্যে গমন করিলেন। এইখানে তৃতীয় সর্গের সমাপ্তি হইয়াছে।

তিলোত্তমার সাহায্যে দেবতাগণের বিজয়লাভ চতুর্থ সর্গের বর্ণনীয় বিষয়। দেবরাজ তিলোত্তমাকে সঙ্গে লইয়া বিন্ধ্যারণ্যে প্রবেশ করিলেন। সেই অরণ্যে সুন্দ উপসুন্দ বিহার করিতেছিল। তিলোত্তমার পশ্চাতে বসন্ত এবং কামদেব। তিলোত্তমা অরণ্যে প্রবেশ করিবার সঙ্গে সঙ্গে বসুধা সুন্দরী—

কুসুম রতনে
সাজিলা। সুবৃক্ষশাখে সুখে পিকদল
আরম্ভিল কলস্বরে মদন-কীর্তন।
মুঞ্জরিল কুঞ্জবন, গুঞ্জরিল অলি
চারিদিকে, স্বনস্বনে মন্দ সমীরণ
ফুলকুল-সৌরভ উপহার লইয়া,
আসি' সম্ভাষিল সুখে ঋতুবংশ-রাজে।

অপরিচিত কুসুমবনে হরিণীর মত কম্পিতচরণে তিলোত্তমা অগ্রসর হইতেছিল। নিজের নূপুরশিঞ্জনে সে নিজেই চমকিয়া উঠিতেছিল—বনপত্রের

মর্ম্মরধ্বনিতে মলয়বায়ুর নিঃশ্বাসে এবং কখনও বা কোকিলের কুহুরবে তিলোত্তমার হৃদয় কম্পিত হইতেছিল!—

মৃদুগতি চলিলা সুন্দরী।
মুহুর্মুহুঃ চারিদিকে চাহে যথা
অজানিত ফুলবনে কুরঙ্গিণী; কভু
চমকে রমণী শুনি নূপুরের ধ্বনি,
কভু মরমর পাতাকুলের মর্ম্মরে,
মলয় নিঃশ্বাসে কভু; হায়রে, কভু বা
কোকিলের কুহুরবে! গুঞ্জরিলে অলি
মধু-লোভী, কাঁপে বামা, কমলিনী যথা
পবন-হিল্লোলে!

তিলোত্তমার পাদপদ্মের স্পর্শে বিন্ধ্যারণ্য শিহরিয়া উঠিয়াছিল—বনদেবী যেন কুসুমদাম গ্রথিত করিতে করিতে সেই অপূর্ব রূপলাবণ্য দেখিয়া বিস্মিতা হইয়া অলকদাম তুলিয়া একদৃষ্টে তাহার প্রতি চাহিয়া রহিলেন। বনদেব তপস্বী—তাই তিনি চক্ষু মুদ্রিত করিলেন।

বনমধ্যে অগ্রসর হইতে হইতে তিলোত্তমা এক সরোবরের তীরে গিয়া উপস্থিত হইল। সেই নির্ম্মল সরসীনীরে নিজের প্রতিবিম্ব দেখিয়া সে নিজেই মুগ্ধ বিস্ময়ে চাহিয়া রহিল। এইখানে কবি পরিপূর্ণ সৌন্দর্যের একখানি আলেখ্য আঁকিয়াছেন। সে সৌন্দর্য অনবদ্য—সে সৌন্দর্য পবিত্র ও স্বর্গীয়! চারিদিকে সুন্দর আবেষ্টন—নির্ঝরিণীর বারি আসিয়া সেই জলাশয় সৃজন করিতেছিল, তাহার চারিদিকে শ্যামতট শত শত কুসুমের বিভিন্ন বর্ণে রঞ্জিত—সরোবরে পদ্ম শোভা পাইতেছিল। চারিদিকে এইরূপ সুন্দর আবেষ্টনের মধ্যে বিশ্বের সকল সৌন্দর্য দিয়া গড়া সেই নারীমূর্ত্তি অধিষ্ঠিতা!

ভ্রমিতে ভ্রমিতে দূতী—অতুলা জগতে
রূপে—উতরিলা যথা বনরাজি মাঝে
শোভে সর, নভস্তল বিমল যেমতি
কলকল স্বরে জল নিরন্তর ঝরি'
পর্বত বিবর হতে, সৃজে সে বিরলে
জলাশয়। চারিদিকে শ্যামতট তার

শতরঞ্জিত কুসুমে। উজ্জ্বল দর্পণ
বনদেবীর সে সর—খচিত রতনে!
হাসে হাসে কমলিনী, দর্পণে যেমনি
বনদেবীর বদন। মৃদু-মন্দ রবে
পবন হিল্লোলে বারি উছলিছে কূলে।
এই সরোবর-তীরে আসি' সীমন্তিনী
(ক্লান্ত এবে) বসিলা বিরামলাভ লোভে,
রূপের আভায় আলো করি' সে কানন।
ক্ষণকাল বসি' বামা চাহি' সর পানে
আপন প্রতিমা হেরি—ভ্রান্তি-মদে মাতি.
এক দৃষ্টে তার দিকে চাহিতে লাগিলা
বিবশে! "এ হেন রূপ"—কহিলা রূপসী
মৃদুস্বরে—"কারো আঁখি দেখেছে কি কভু?"—

এ বর্ণনা মিলটনের প্যারাডাইস্-লষ্টের একটি চিত্রের অনুরূপ। প্যারাডাইস্ লষ্টের ঈভ এইভাবেই সরসীনীরে আপন সৌন্দর্য দেখিয়া আপনি বিমুগ্ধ হইয়াছিল।

তিলোত্তমা সরোবর তীর ছাড়িয়া যখন কাননপথে পুনরায় অগ্রসর হইল তখন, পরিপূর্ণ সেই সৌন্দর্য-মূর্তিটিকে দেখিয়া বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে অপরিসীম আনন্দ সঞ্চার হইল,--তৃণলতা, তরুপল্লব, পশুপাখী, অলিকুল তাহার সহিত আত্মীয়তা স্থাপনের আকূতি প্রকাশ করিল।

কত স্বর্ণলতা
সাধিল ধরিয়া, আহা, রাঙা পা দুখানি,
থাকিতে তাদের সাথে; কত মহীরুহ,
মোহিত মদন-মদে, দিলা পুষ্পাঞ্জলি,
কত যে মিনতি স্তুতি করিলা কোকিল
কপোতীর সহ; কত গুণ গুণ করি'
আরাধিল অলিদল,—কে পারে কহিতে?
আপনি ছায়া সুন্দরী—ভানুবিলাসিনী—
তরুমূলে, ফুল ফল ডালায় সাজায়ে
দাঁড়াইলা—সখীভাবে ধরিতে বামারে;

নীরবে চলিলা সাথে সাথে প্রতিধ্বনি ;
কলরবে প্রবাহিণী—পর্বত-দুহিতা—
সম্বোধিলা চন্দ্রাননে, বনচর যত
নাচিল হেরিয়া দূরে বন-শোভিনীরে,
যথা, রে দণ্ডক, তোর নিবিড় কাননে,
(কত যে তপস্যা তোর কে পারে বুঝিতে ?)
হেরি বৈদেহীরে—রঘুরঞ্জন-রঞ্জিনী !
সাহসে সুরভি-বায়ু, ত্যজি কুবলয়ে,
মুহুর্মুহু অলকান্ত উড়াইয়া কামী
চুম্বিলা বদন-শশী ! তা দেখি কৌতুকে
অন্তরীক্ষে মধুসহ মদন হাসিলা !—

বনবিহার-রত সুন্দ উপসুন্দ অকস্মাৎ তিলোত্তমার বর-বপুর সৌরভে আকৃষ্ট হইয়া বলিলেন—

কি আশ্চর্য, দেখ—
দেখ, ভাই, পূর্ণ আজি অপূর্ব সৌরভে
বনরাজি ! বসন্ত কি আবার আইল ?
আইস দেখি, কোন্ ফুল ফুটি' আমোদিছে
কানন ?

তিলোত্তমার সৌন্দর্যে মুগ্ধ হইয়া প্রথমে দৈত্যভ্রাতাদ্বয় তাহাকে দেবী বলিয়া মনে করিয়াছিল।—

দেখ চাহি', ওই নিকুঞ্জ মাঝারে।
উজল এ বন বুঝি দাবাগ্নিশিখাতে
আজি ; কিম্বা ভগবতী আইলা আপনি
গৌরী ! চল, যাই ত্বরা, পূজি পদযুগ !
দেবীর চরণ-পদ্ম সদ্মে যে সৌরভ
বিরাজে, তাহাতে পূর্ণ আজি বনরাজি !

কিন্তু তখনি—

মধু মন্মথে সম্ভাষি,
মৃদুস্বরে ঋতুবর কহিলা সত্বরে,—

"হান তব ফুলশর, ফুল ধনু ধরি'
ধনুর্ধর,..."

এই বার দৈত্যকুলের সর্বনাশের বীজ উপ্ত হইল। কামান্ধ উভয় ভ্রাতার মধ্যে প্রবল যুদ্ধ বাধিল—যুদ্ধে অস্ত্রাঘাতে উভয়েই ভূমিতে লুণ্ঠিত হইলেন। দেবতাগণ এই সংবাদে দৈত্যদেশ বেষ্টন করিয়া, দৈত্যদিগকে পরাজিত করিয়া স্বর্গরাজ্য পুনরায় উদ্ধার করিলেন। তিলোত্তমা দেবেন্দ্রের আদেশে সূর্যলোকে প্রস্থান করিল। দেবতাগণের স্বর্গরাজ্য পুনরুদ্ধার ও তিলোত্তমার সূর্যলোকে প্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গে তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যের পরিসমাপ্তি হইয়াছে।

কবির তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যে অনাবিল এবং পরিপূর্ণ সৌন্দর্যের বর্ণনা ও জয়গান প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। কাব্যখানির মধ্যে মধুসূদনের অতি সূক্ষ্ম সৌন্দর্যানুভূতির পরিচয় আছে—কাব্যের অন্ত্যোপান্ত প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মনোরম বর্ণনা আছে। নিসর্গ-সৌন্দর্যের আবেষ্টনের মধ্যে তিলোত্তমার উদ্ভব হইয়াছে—বসন্ত তাহার নিত্যসহচর।

তিলোত্তমা সকল সম্পর্কাতীত অনাবিল সৌন্দর্য এবং এই কাব্য সেই অনাবিল সর্বসম্পর্কবিহীন সৌন্দর্যেরই মহিমাকীর্তন। সেই হিসাবে রবীন্দ্রনাথের উর্বশীর সহিত তিলোত্তমার সাদৃশ্য আছে। বলিতে গেলে, তিলোত্তমাই রবীন্দ্রনাথের উর্বশীর আগমনী গাহিয়াছে। উর্বশী কবিতায় রবীন্দ্রনাথ যেমন —"সৌন্দর্যদেবীকে তাহার সমস্ত প্রয়োজনীয়তার সঙ্কীর্ণ সীমা হইতে দূরে, তাহার বিশুদ্ধিতার মধ্যে, তাহার অখণ্ডতার উপলব্ধি করিবার তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন,"—তিলোত্তমাতেও তাই। উর্বশীর মত তিলোত্তমার সৌন্দর্য সমস্ত প্রয়োজনের সঙ্কীর্ণ সীমা হইতে দূরে,—সে সৌন্দর্য বিশুদ্ধ, প্রয়োজনাতিরিক্ত। উর্বশীর মতই তিলোত্তমা প্রথমেই পূর্ণ প্রস্ফুটিতা, পরিপূর্ণ-যৌবনা। এইরূপ সৌন্দর্যদেবী কামনারাজ্যের রাণী নহে।

কবি বলিয়াছেন, দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা যে মূর্তি সৃষ্টি করিয়াছিলেন, উহা যেন মূর্তিমতী প্রভা।

সুমোহিনী বেশে
দাঁড়াইয়া প্রভা যেন আহা মূর্তিমতী।

এ মূর্তিকে শরীরিণী বলিয়া মনে হয় না। ইহার লাবণ্যদ্যুতিটুকু মাত্র চোখে পড়ে—কবি ইহার দেহাংশটুকু হরণ করিয়া লইয়াছেন। তিলোত্তমা তাই

সৌন্দর্যের ভাবপ্রতিমা। এইরূপ সৌন্দর্য 'দুরাপনা বাতম্ ইব'—বাতাসের মত অধরা, fugitive (Hegel)—চিরচঞ্চলা। এরূপ সৌন্দর্যকে সম্ভোগ করার উপায় নাই। সেইজন্যই এই সৌন্দর্যকে ভোগের গণ্ডীর মধ্যে আনিতে গিয়া সুন্দ উপসুন্দ ব্যর্থ হইয়াছে।

সুন্দরকে সম্ভোগ করিবার কামনা মনে স্থান দিলে অভিশপ্ত হইতে হয়—একথা কালিদাস তাঁহার কাব্যনাটকে প্রচার করিয়াছিলেন। শকুন্তলা-দুষ্মন্ত যেখানে কেবলমাত্র ভোগলিপ্সার আকর্ষণে মিলিত হইতে চাহিয়াছেন, সেখানে তাঁহারা শাপগ্রস্ত হইয়াছেন। কামনাপরবশ যক্ষকে প্রভুশাপে প্রিয়ার সঙ্গ হইতে বঞ্চিত হইয়া নির্বাসিত হইতে হইয়াছিল। শিব পার্বতীর সহিত মিলিত হইবার পূর্বে মদনকে ভস্মীভূত করিয়াছিলেন। কালিদাসের এই সৌন্দর্যতত্ত্বই তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যে রহিয়াছে।

কাব্যখানির মধ্যে কেবল প্রাচ্য কল্পনা বা বর্ণনাভঙ্গি অনুসৃত হয় নাই. প্রতীচ্যের কল্পনা ও বর্ণনাভঙ্গিও রহিয়াছে। ইংলণ্ডের কবি কীটস, মিলটনের প্রভাব ইহাতে সুস্পষ্ট। কীটসের হাইপিরিয়নের প্রথমাংশের সহিত রাজ্যচ্যুত ও শক্রকর্তৃক তাড়িত দেবরাজ ইন্দ্রের সাদৃশ্য আছে। তিলোত্তমার সৌন্দর্য-বর্ণনা অনেক ক্ষেত্রেই প্যারাডাইস লষ্টের ঈভের সৌন্দর্য বর্ণনার অনুরূপ।

প্রাচ্য আদর্শ অনুযায়ী মধুসূদন এ কাব্যের প্রারম্ভেই সরস্বতী-বন্দনা করিয়াছেন। আবার প্রতীচ্যের আদর্শ অনুযায়ী কল্পনার অধিষ্ঠাত্রী দেবীর (Muse) বন্দনাও তিনি করিয়াছেন। প্রথম সর্গে কবি বলিয়াছেন—

> কবি, দেবি, তব পদাম্বুজে
> প্রণমি, জিজ্ঞাসে তোমা, কহ, দয়াময়ি,
> তব কৃপা,—মন্দর দানব দেব বল,
> শেষের অশেষ দেহ—দেহ এ দাসেরে .
> এ বাক সাগর আমি মথি সযতনে,
> লভি, মা, কবিতামৃত—নিরুপম সুধা!
> অকিঞ্চনে কর দয়া, বিশ্ববিনোদিনি!

দ্বিতীয় সর্গের প্রারম্ভে কবি বলিতেছেন—

> হে সারদে, দেবি বিশ্ববিনোদিনি,
> তব বলে বলী যে, মা, কি অসাধ্য তার

এ জগতে ? উর তবে, উর পদ্মালয়া
বীণাপাণি ! কবির হৃদয়-পদ্মাসনে
অধিষ্ঠান কর উরি ! কল্পনাসুন্দরী
হৈমবতী কিঙ্করী তোমার, শ্বেতভুজে,
আন সঙ্গে, শশিকলা কৌমুদী যেমতি।
এ দাসেরে বর যদি দেহ গো বরদে,
তোমার প্রসাদে, মাতঃ, এ ভারতভূমি
শুনিবে, আনন্দার্ণবে ভাসি নিরবধি,
এ মম সঙ্গীতধ্বনি মধু হেন মানি'।

তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যের ভাষা ও ছন্দের ধ্বনিমাধুর্য নূতন, ইহার বর্ণনা-রীতিও নূতন। এই কাব্যখানির প্রকাশকাল হইতেই বাংলা কাব্যসাহিত্যের আধুনিক যুগের আরম্ভকাল ধরিতে হয়। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিতা যে আধুনিকতার পরিচয়-বিহীন তাহা নহে। তাঁহার দেশপ্রেম এবং ঈশ্বরস্তোত্র বিষয়ক কবিতাবলী পাশ্চাত্ত্য প্রভাবের ফল। তিনিই সর্বপ্রথম বাংলা সাহিত্যে আখ্যায়িকা-নিরপেক্ষ কবিতা রচনা করিয়া মধ্যযুগের গতানুগতিকতার স্রোতটিকে ব্যাহত করিয়াছিলেন। তথাপি তিনি মধ্যযুগের প্রভাব হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হইতে পারেন নাই। তাঁহার কাব্যের অনুপ্রাসবহুলতা, তাঁহার ভাষা ও ছন্দ মধ্যযুগের সাহিত্যের আদর্শই অনুসরণ করিয়াছিল। কিন্তু মধুসূদনে আমরা পাই—ভাব ভাষা ও ছন্দের একটা আমূল পরিবর্তন। তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যে ঐ সকল নূতনত্বের প্রথম উন্মেষ।

মেঘনাদবধ কাব্য

মধুসূদনের সর্বশ্রেষ্ঠ কবিকৃতি তাঁহার মেঘনাদবধ কাব্য। মধুসূদনের মন ছিল পাশ্চাত্ত্য মহাকাব্যসঞ্চারী। পাশ্চাত্ত্য মহাকাব্যসমূহের রস ও ভাবের আস্বাদন করিয়া একখানি মহাকাব্য রচনায় প্রয়াসী হইয়া তিনি সৃষ্টি করিয়াছিলেন মেঘনাদবধ কাব্য। এই কাব্যে কবির প্রতিভা পূর্ণবিকাশ লাভ করিয়াছে। কবি এখানে দক্ষ স্রষ্টা হইয়া উঠিয়াছেন। চরিত্রসৃষ্টিতে, ভাষা ও ছন্দের ধ্বনিলাবণ্য পরিস্ফুটনে, ঘটনা-বিন্যাসে এ কাব্যে কবির সৃজনী প্রতিভার পরিচয় রহিয়াছে। কাব্যখানিতে দেশপ্রীতি এবং মানবতাবোধ প্রবল সঙ্গীতচ্ছন্দে প্রকাশ পাইয়াছে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য কাব্যসাহিত্যের সম্পদ এই কাব্যের মধ্যে বর্তমান,—ইহা এ কাব্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। মিলটনের কাব্যের ছন্দ, হোমার হইতে গ্রীক পুরাণের ভাব এবং আদর্শ এই কাব্যে আসিয়া গিয়াছে। এ কাব্যের বিষয়সজ্জা, বর্ণনারীতি প্রভৃতিতেও গ্রীক প্রভাব সুস্পষ্ট। ভার্জিলের ইনিড, ট্যাসোর জেরুজালেম ডেলিভার্ড, বাল্মীকি ও কৃত্তিবাসের রামায়ণ, কাশীরাম দাসের মহাভারত প্রভৃতির ভাব কল্পনা ও বিষয়বস্তুর দ্বারাও এ কাব্যের সৌন্দর্যসাধন হইয়াছে।

মেঘনাদবধ কাব্যের মূল আখ্যায়িকা রামায়ণ হইতে গৃহীত। রাবণের পুত্র মেঘনাদের মৃত্যু ইহার বর্ণনীয় বিষয়। কিন্তু কবি রামায়ণকে সর্বত্র অনুসরণ করেন নাই। এ কাব্যে কবি প্রাচীন আখ্যানকে অবলম্বন করিয়া নূতন কাব্য রচনা করিয়াছেন। কালিদাস যেমন রঘুবংশে অথবা ভবভূতি যেমন তাঁহার উত্তররামচরিতে নিজেদের প্রতিভার স্বাতন্ত্র্য দেখাইয়াছেন, তেমনি মধুসূদনও এই কাব্য রচনায় তাঁহার প্রতিভার স্বাতন্ত্র্য দেখাইয়া গিয়াছেন। প্রাচীন আখ্যান অবলম্বন করিয়া নূতন কাব্য রচনায় যে কতখানি কৃতিত্ব ও মৌলিকতা প্রকাশ পাইতে পারে জগতের বহু কবিই তাহার দৃষ্টান্তস্থল। মিলটনের প্রধান কাব্য বাইবেলের মূল আখ্যান অবলম্বন করিয়া লিখিত। মাঘের শিশুপালবধম্ এবং ভারবির কিরাতার্জুনীয়ম্ এই উভয় রচনাই প্রাচীন আখ্যায়িকা অবলম্বন করিয়া রচিত হইয়াছিল।

কবিগণ প্রাচীন আখ্যান অবলম্বন করিয়া অথবা পরের উপকরণ লইয়াও নিজের প্রতিভার গুণে তাহাকে নূতনত্ব দান করিতে পারেন। দেশ-কাল-পাত্রভেদে ও পারিপার্শ্বিক প্রভাবের বশবর্তী হইয়া কবিগণ প্রাচীন কাহিনীকে—মূল আদর্শকে নূতন পরিচ্ছদে ভূষিত করিয়া প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, এমন দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে বিরল নহে। মধুসূদন কাব্যসৃষ্টি করিতে গিয়া এই নীতিরই অনুসারী হইয়াছিলেন। পুরাণ হইতে কাব্যরচনার উপকরণ সমাহৃত হইলেও কবির এ কাব্য নূতন সৃষ্টিই হইয়াছে। পুরাণকাহিনী যুগোপযোগী কাব্য হইয়া উঠিয়াছে—কাব্যখানি রামায়ণের ঘটনা লইয়া রচিত হইলেও ইহাতে রামায়ণে অনুল্লিখিত অনেক ঘটনা ও চরিত্রের সমাবেশ দেখা গিয়াছে এবং মেঘনাদবধ কাব্যের মধ্যে মানুষেরই শোক-বেদনা, হাসি-অশ্রু, সৌভাগ্য-দুর্ভাগ্যের কাহিনী স্থান পাইয়াছে।

মধুসূদনের মেঘনাদবধ কাব্যে অনেক নূতনত্বও আছে। রামায়ণে রামের প্রতি সহানুভূতি এবং রাক্ষসগণের প্রতি বিরাগ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু মধুসূদন রামায়ণের সেই আদর্শ পরিত্যাগ করিয়া রাক্ষসদিগের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছিলেন—

I despise Rama and his rabble. The idea of Ravana elevates and kindles my imagination.

মধুসূদন দেখিয়াছিলেন যে, রাবণের চরিত্রে এমন একটি বেগ ও উদ্যম আছে, যাহা শান্ত নিরুপদ্রবে জীবনযাত্রাপ্রয়াসী রামের মধ্যে নাই। এই জন্যই রাম অপেক্ষা রাবণের প্রতিই কবির বেশী আকর্ষণ। এইজন্যই এ কাব্যের মধ্যে বীর মেঘনাদ কবির সহানুভূতি লাভ করিয়াছে। অপর পক্ষে মধুসূদন রামের চরিত্র নিতান্ত হীন না করিলেও, তাঁহাকে অত্যন্ত শান্ত, বিপদে কাতর ও দুর্বলচিত্ত করিয়াছেন। দেশদ্রোহী বিভীষণকে কুলাঙ্গার করিয়া চিত্রিত করিয়াছেন।

কবি দেখিয়াছিলেন, রাবণের চরিত্র বিচিত্র মর্যাদায় মণ্ডিত। তিনি মহামহিমান্বিত সম্রাট্, স্নেহশীল পিতা,—তিনি ভ্রাতা, স্বামী, শৌর্যবীর্যসম্পন্ন যোদ্ধা ও নিষ্ঠাবান্ ভক্ত। মমত্ব ও আত্মীয়বৎসলতায় তিনি অতুলনীয়, আপন শক্তির উপর তাঁহার সুগভীর বিশ্বাস। বীরত্ব ও শক্তিতে, ঐশ্বর্যে ও মমতায় শ্রেষ্ঠ এইরূপ একটি চরিত্রের ব্যর্থতা বর্ণনাই মেঘনাদবধ কাব্যের

উদ্দেশ্য। রাবণের সেই ব্যর্থতার মূলে কবি দেখিয়াছেন এক দুর্বোধ্য অদৃশ্য শক্তি। উহাই মানবভাগ্য বা নিয়তি। ইহারই আর এক নাম 'বিধি'। উহার নিকট ভাল-মন্দের ভেদ নাই, উচ্চ-নীচ সকলেই উহার নিকট সমান। এই 'বিধি'ই পদে পদে রাবণের বিশ্বজয়ী শক্তিকে প্রতিহত করিয়া তাঁহাকে সর্বস্বান্ত করিয়াছে, বলদৃপ্ত রাবণকে পদে পদে পরাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য করিয়াছে। এই 'বিধি'ই মেঘনাদবধ মহাকাব্যের ট্র্যাজেডির মূল। রাবণ ইহারই দ্বারা বারংবার নির্জিত হইয়া আক্ষেপ করিয়াছেন—'বিধির বিধি কে পারে খণ্ডিতে।' পুত্র মেঘনাদের নিকট বলিয়াছেন—

হায় বিধি বাম মম প্রতি,
কে কবে শুনেছে পুত্র, ভাসে শিলা জলে?
কে কবে শুনেছে লোক মরি পুনঃ বাঁচে?

রাবণের সকল অহঙ্কার, সকল শক্তি এই বিধির বিধানে ব্যর্থ হইয়াছে। কুসুমদাম-সজ্জিত দীপাবলী-তেজে উজ্জ্বলিত নাট্যশালাসম তাঁহার সুন্দর পুরীতে এই বিধির বিধানেই একে একে ফুল শুকাইয়াছে, দেউটি নিভিয়াছে, রবাব বীণা মুরজ মুরলীধ্বনি স্তব্ধ হইয়াছে।

নিয়তিপাশবদ্ধ মানবের করুণ ক্রন্দন মেঘনাদবধ কাব্যের মূল সুর। রাবণের পৌরুষ এবং সেই পৌরুষের পরাভবই মেঘনাদবধ কাব্যের ট্র্যাজেডি। রাবণের মধ্যে কবি নিপীড়িত মানবতার ক্রন্দনসঙ্গীত শুনিয়াছেন। সেই হিসাবে মধুসূদনের কাব্যবর্ণিত রাবণ রামায়ণের চরিত্র হইয়াও রামায়ণ-বহির্ভূত চরিত্র—এ চরিত্র নিয়তিলাঞ্ছিত মানবভাগ্যের প্রতীক।

মানুষের কথা লইয়াই মহাকাব্য রচিত হইয়া থাকে। এ সম্বন্ধে পাশ্চাত্ত্য সমালোচকদের উক্তি এইরূপ—

The epic hero has always represented humanity by being superhuman.

It is of man and of man's purpose in the world that the epic poet has to sing.—*Abercrombie.*

অলৌকিক শক্তির অধিকারী হইয়াও মহাকাব্যের নায়ক মানবভাগ্য ও মানব-চরিত্রেরই প্রতীক হইয়া থাকে। মেঘনাদবধ কাব্যে উহাই দেখিতে পাওয়া গিয়াছে।

কাব্যের প্রথমেই রাবণ তাঁহার পুত্র বীরবাহুর মৃত্যুসংবাদ পাইয়াছেন,—কিন্তু এ সংবাদ তিনি বিশ্বাস করিতে পারেন নাই। তাই তিনি বলিয়াছিলেন—

নিশার স্বপনসম তোর এ বারতা,
রে দূত! অমরবৃন্দ যার ভুজবলে
কাতর, সে ধনুর্ধরে রাঘব ভিখারী
বধিল সম্মুখ রণে? ফুলদল দিয়া
কাটিলা কি বিধাতা শাল্মলী তরুবরে?—

কিন্তু দূতমুখে পুত্র বীরবাহুর বীরত্ব কাহিনী শ্রবণ করিয়া এবং যুদ্ধক্ষেত্রে দেশরক্ষার জন্য তাহার আত্মত্যাগের কথা শুনিয়া রাবণ গর্ব অনুভব করিয়াছেন। পুত্রের বীরত্ব শ্রবণ করিয়া তিনি পুত্রশোক বিস্মৃত হইয়া বলিয়াছিলেন—

সাবাসি দূত! তোর কথা শুনি'
কোন্ বীর হিয়া নাহি চাহে রে পশিতে
সংগ্রামে? ডমরুধ্বনি শুনি' কাল-ফণী
কভু কি অলসভাবে নিবাসে বিবরে?
ধন্য লঙ্কা, বীরপুত্রধাত্রী! চল সবে,—
চল যাই, দেখি, ওহে সভাসদ্জন,
কেমনে পড়েছে রণে বীর-চূড়ামণি
বীরবাহু; চল দেখি' জুড়াই নয়ন।

লঙ্কার প্রাসাদশীর্ষ হইতে বীরবাহুর মৃতদেহ দেখিয়া রাবণের স্বদেশপ্রেম প্রকাশ পাইয়াছে—

যে শয্যায় আজি তুমি শুয়েছ, কুমার
প্রিয়তম, বীরকুল-সাধ এ শয়নে
সদা! রিপুদলবলে দলিয়া সমরে,
জন্মভূমি রক্ষাহেতু কে ডরে মরিতে?
যে ডরে, ভীরু সে মূঢ়; শত ধিক্ তারে,
তবু, বৎস, যে হৃদয় মুগ্ধ মোহমদে,
কোমল সে ফুলসম। এ বজ্র-আঘাতে
কত যে কাতর সে, তা জানে সে জন,
অন্তর্যামী যিনি, আমি কহিতে অক্ষম।

চিত্রাঙ্গদার সহিত কথোপকথনেও রাবণের স্বদেশপ্রেম ব্যক্ত হইয়াছে। পুত্রশোকে শোকাকুলা চিত্রাঙ্গদা যখন রাবণকে বলিয়াছিলেন—

একটি রতন মোরে দিয়াছিল বিধি
কৃপাময় ; দীন আমি থুয়েছিনু তারে
রক্ষাহেতু তব কাছে রক্ষকুলমণি,
তরুর কোটরে রাখে শাবক যেমতি
পাখী। কহ কোথা তুমি রেখেছ তাহারে,
লঙ্কানাথ ? কোথা মম অমূল্য রতন ?
দরিদ্র-ধন-রক্ষণ রাজ-ধর্ম ; তুমি
রাজকুলেশ্বর ; কহ, কেমনে রেখেছ,
কাঙ্গালিনী আমি, রাজা, আমার সে ধনে ?

ইহার উত্তরে রাবণ বলিয়াছিলেন—

এ বিলাপ কভু, দেবি, সাজে কি তোমারে ?
দেশবৈরী নাশি' রণে পুত্রবর তব
গেছে চলি স্বর্গপুরে ; বীরমাতা তুমি,
বীরকর্মে হত পুত্র-হেতু কি উচিত
ক্রন্দন ? এ বংশ মম উজ্জ্বল হে আজি
তব পুত্রপরাক্রমে ; তবে কেন তুমি
কাঁদ, ইন্দু-নিভাননে, তিতি অশ্রুনীরে !

রাবণের এই সমস্ত উক্তির মধ্য দিয়াই তাঁহার স্বদেশপ্রীতি প্রকাশ পাইয়াছে। স্বদেশরক্ষার জন্য পুত্র মেঘনাদকে যুদ্ধে না পাঠাইয়া তিনি নিজেই যুদ্ধযাত্রার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন। ইহাও তাঁহার স্বদেশানুরাগের পরিচয় দিতেছে।

মেঘনাদের স্বদেশপ্রেমও কবি উজ্জ্বলবর্ণে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। প্রমোদ-উদ্যানে মেঘনাদের নিকট ছদ্মবেশধারিণী প্রভাষা ধাত্রীরূপিণী কমলা লঙ্কার দুর্দশার বিষয় বর্ণনা করিলে মেঘনাদ—

ছিঁড়িলা কুসুম-দাম রোষে মহাবলী
মেঘনাদ ; ফেলাইলা কনক-বলয়
দূরে ; পদতলে পড়ি' শোভিল কুণ্ডল,
যথা অশোকের ফুল অশোকের তলে

আভাময় ! "ধিক মোরে"—কহিলা গম্ভীরে
কুমার ; "হা ধিক মোরে ! বৈরি দল বেড়ে
স্বর্ণলঙ্কা, হেথা আমি বামাদল মাঝে !
এই কি সাজে আমারে, দশাননাত্মজ
আমি ইন্দ্রজিৎ : আন রথ ত্বরা করি'
ঘুচাব এ অপবাদ বধি রিপুকুলে।"

মেঘনাদের মাতা মন্দোদরী পুত্রকে যুদ্ধে পাঠাইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়া বিলাপ করিতে থাকিলে বীর মেঘনাদ উত্তর দিয়াছিলেন—

নগর তোরণে অরি ; কি সুখ ভুঞ্জিব,
যত দিন নাহি তারে সংহারি সংগ্রামে !
আক্রমিলে হুতাশন কে ঘুমায় ঘরে ?
বিখ্যাত রাক্ষস-কুল, দেব-দৈত্য-নর-
ত্রাস ত্রিভুবনে, দেবি ! হেন কুলে কালি
দিব কি রাঘবে দিতে, আমি, মা, রাবণি
ইন্দ্রজিৎ ? কি কহিবে শুনিলে এ কথা,
মাতামহ দনুজেন্দ্র মম ? রথী যত,
মাতুল ? হাসিবে বিশ্ব ! আদেশ দাসেরে,
যাইব সমরে, মাতঃ, নাশিবে রাঘবে !

ইলিয়াড্ কাব্যে হেক্টরপত্নী স্বামীকে যুদ্ধে যাইতে নিষেধ করিলে হেক্টরও এইরূপ বলিয়াছিল—

I should stand
Ashamed before the men
and long robed
Of Troy, were I to keep aloof
and shun
The conflict, coward-like.

মেঘনাদবধ কাব্যে কেবল যে ব্যক্তিগত চরিত্রের মধ্য দিয়াই স্বদেশ-বাৎসল্য উৎসারিত হইয়াছে তাহা নহে। কবি যেখানে লঙ্কার শোচনীয় দুর্দশার কথা বলিয়াছেন, তাহাও প্রকারান্তরে পরাধীন ভারতের প্রতিবিম্ব বলিয়াই মনে হয়। যেমন—

নয়নে তব, হে রাক্ষসপুরি
অশ্রুবিন্দু, মুক্তকেশী শোকাবেশে তুমি !
ভূতলে পড়িয়া, হায় ; রতন-মুকুট
আর রাজ-আভরণ, হে রাজ-সুন্দরি
তোমার ! উঠ গো শোক পরিহরি' সতি ।
রক্ষকুল-রবি ওই উদয় অচলে ।
প্রভাত হইল তব দুঃখ-বিভাবরী ।
উঠ রাণি, দেখ, ওই ভীম বাম করে
কোদণ্ড, টঙ্কারে যার বৈজয়ন্ত ধামে
পাণ্ডুবর্ণ আখণ্ডল ! দেখ তূণ, যাহে
পশুপতি-ত্রাস অস্ত্র—পাশুপত সম !
গুণিগণ-শ্রেষ্ঠ গুণী, বীরেন্দ্র কেশরী,
কামিনী-রঞ্জনরূপ দেখ মেঘনাদে !
ধন্য রাণী মন্দোদরী ! ধন্য রক্ষঃপতি
নৈকষেয় ! ধন্য লঙ্কা, বীর-ধাত্রী তুমি !
আকাশ-দুহিতা ওগো শুন প্রতিধ্বনি,
কহ সবে মুক্তকণ্ঠে, সাজে অরিন্দম
ইন্দ্রজিৎ ! ভয়াকুল কাঁপুক শিবিরে
রঘুপতি, বিভীষণ রক্ষঃকুল-কালি,
দণ্ডক-অরণ্যচর ক্ষুদ্র প্রাণী যত ।

উল্লিখিত পংক্তি কয়টিতে কবি যেন আমাদেরই দেশের দুর্দশা অপনোদনের নিমিত্ত দেশবাসিগণকে দেশের প্রাচীন গৌরবের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন ।

সোনার লঙ্কার দুর্দশা বর্ণনায় কবি যে কয়টি পংক্তি দশাননের উক্তিতে বিন্যস্ত করিয়াছেন তাহাতে আমাদেরই জন্মভূমির অতীত গৌরবের কথা এবং পরাধীনতার হীনাবস্থার কথা স্মরণ হয়—

কুসুমদাম সজ্জিত দীপাবলীতেজে
উজ্জ্বলিত নাট্যশালা সম রে আছিল
এ মোর সুন্দর পুরী ! কিন্তু একে একে
শুকাইছে ফুল এবে, নিবিছে দেউটি

নীরব রবাব, বীণা, মুরজ, মুরলী ;
তবে কেন আর আমি থাকি রে এখানে ?
কার রে বাসনা বাস করিতে আঁধারে ?

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, মেঘনাদবধ কাব্যে মধুসূদন রামায়ণকে সর্বত্র অনুসরণ করেন নাই। এই কাব্যে রাক্ষস ও বানর সকলেই মানুষ। রাম-লক্ষ্মণ-সীতাও দেবতা নহেন, সদ্‌গুণভূষিত মানব মাত্র। রাক্ষস ও বানরদের মধ্যেও মহামানবোচিত সদ্‌গুণরাশির অভাব নাই।

মেঘনাদবধ কাব্য নয় সর্গে বিভক্ত। এই নয় সর্গে তিন দিন ও দুই রাত্রির ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু কবির বর্ণনাগুণে এই স্বল্পকালব্যাপী ঘটনা যেন কত দীর্ঘকালের প্রত্যক্ষদৃষ্ট ঘটনা বলিয়া মনে হয়। মাত্র তিন দিনের ঘটনা হইলেও মেঘনাদবধে রামায়ণের সমগ্র আখ্যানের সার সংগ্রহ হইয়াছে। ইহার কারণ, কবি এই কাব্যে পাশ্চাত্ত্য বর্ণনা-পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছেন। প্রাচ্য কাব্যের বর্ণনারীতি অনুসরণ করেন নাই। প্রাচ্য কাব্যে কবিগণ বর্ণিত বিষয়টিকে প্রথম হইতে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরিচয় দিতে দিতে অগ্রসর হন। কিন্তু পাশ্চাত্ত্য মহাকাব্যে, বিশেষত হোমারের মহাকাব্যে, দেখা গিয়াছে যে, ঘটনার মধ্য হইতে প্রসঙ্গটি আরম্ভ করিয়া কৌশলক্রমে সমস্ত কাহিনীটি বর্ণনা করা হইয়াছে। মধুসূদন তাঁহার মেঘনাদবধে এই কৌশল অবলম্বন করিয়াছিলেন। লঙ্কাযুদ্ধকালে বীরবাহুর মৃত্যুতে রাবণের বিলাপ দ্বারা কাব্যের আরম্ভ হইয়াছে বটে। কিন্তু কবি রামের বনবাসের কথা, পঞ্চবটী বনে রাম লক্ষ্মণ সীতার অবস্থানের কথা ও সীতাহরণের কথা সুকৌশলে পাত্রপাত্রীর কথোপকথনের মধ্য দিয়া, অথবা স্বগত উক্তির দ্বারা কাব্যমধ্যে বর্ণনা করিয়া রামায়ণের সমগ্র আখ্যায়িকাটিকে প্রকাশ করিয়াছেন।

মধুসূদন পাশ্চাত্ত্য কবিগণের আদর্শে তাঁহার মেঘনাদবধ কাব্য আরম্ভ করিয়াছেন। প্রাচ্য কাব্য নাটক প্রভৃতিতে নান্দী, স্তুতি বা মঙ্গলাচরণের পর যেভাবে গ্রন্থ আরম্ভ করা হয়, সেই রীতি পরিত্যাগ করিয়াছেন। কাব্যারম্ভে মধুসূদন হোমার, ভার্জিল ও মিল্‌টনের আদর্শ অনুসরণ করিয়াছেন।

বন্দি চরণারবিন্দ, অতি মন্দমতি
আমি ; ডাকি আবার তোমায়, শ্বেতভুজে

ভারতি ! যেমতি মাতঃ বসিলা আসিয়া,
বাল্মীকির রসনায় পদ্মাসনে যেন
যবে খরতর শরে, গহন কাননে,
ক্রৌঞ্চবধূ সহ ক্রৌঞ্চে নিষাদ বিঁধিলা—
তেমতি দাসেরে' আসি', দয়া কর সতি !
... ...
—তুমিও আইস, দেবি, তুমি মধুকরী
কল্পনা ! কবির চিত্ত-ফুলবন-মধু
লয়ে, রচ মধুচক্র, গৌড়জন যাহে
আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি ।

উদ্ধৃত শেষ চারি পংক্তির বন্দনায় সরস্বতীর ছদ্মবেশ খসিয়া গিয়াছে—কবি এখানে ইউরোপীয় কাব্যের Muse-এর বন্দনা করিয়াছেন।

মধুসূদনের কাছে কল্পনার অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতীর নিত্যসহচরী। চতুর্দশপদী কবিতাবলীর মধ্যে ইঁহাকে সম্বোধন করিয়াই কবি পরবর্তীকালে লিখিয়াছিলেন—

লও দাসে সঙ্গে রঙ্গে, হেমাঙ্গি কল্পনে,
বাগ্দেবীর প্রিয় সখী।

কবির ধারণা, কবিগণের চিত্তকমলে কল্পনার অধিষ্ঠাত্রী দেবীর বাস এবং ইঁহারই অনুগ্রহে কবি-কল্পনার বিকাশ ঘটিয়া থাকে, ভাব রূপ গ্রহণ করিয়া থাকে।

মেঘনাদবধ কাব্যের প্রারম্ভেই কবি একদিকে প্রাচ্য, অন্যদিকে পাশ্চাত্ত্য কবিদিগের আদর্শে বাগ্‌দেবীর বন্দনা করিয়া তাঁহার কাব্যের বস্তুনির্দেশ করিয়াছেন। ইহার পরে সভাস্থ রাক্ষসরাজের ঐশ্বর্যের বর্ণনা। সেই সভায় বীরবাহুর মৃত্যুসংবাদ আসিয়াছে বলিয়া ঐশ্বর্যমণ্ডিত সভা নিরানন্দ। দূতের মুখে রাবণ তাঁহার পুত্র বীরবাহুর বীরত্বকাহিনী শুনিলেন, শুনিয়া সভাস্থ-সকলকে লইয়া প্রাসাদশিখরে গমন করিলেন। তথা হইতে যুদ্ধক্ষেত্র, নগর ও সাগর দর্শন করিয়া রাবণ অতি করুণাভরে বিলাপ করিয়াছেন। পুত্রশোকাতুর রাবণের আক্ষেপের মধ্য দিয়া একদিকে রাক্ষস-রাজের দেশপ্রেম আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, অপরদিকে তাঁহার পুত্রস্নেহ প্রকাশ

পাইয়াছে। কবির বর্ণনার গুণে অতি অল্প কথায় এই প্রথম সর্গে রাবণের স্বদেশপ্রেম আর স্নেহশীল পিতৃহৃদয় আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।)

দেশরক্ষায় পুত্র আত্মোৎসর্গ করিয়াছে বলিয়া রাবণ গর্বিত, কিন্তু পুত্রস্নেহে তিনি কাতর। রাবণ এখানে পুত্রস্নেহে বিলাপ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু শোকে বিহ্বল হইয়া তিনি পুত্রের বীরত্ব ও দেশপ্রেম বিস্মৃত হন নাই।

(রণক্ষেত্র দর্শন করিয়া রাবণ পুনরায় আসিয়া সভাস্থলে উপবেশন করিলেন। এমন সময়ে সহসা বীরবাহুর জননী মহিষী চিত্রাঙ্গদার করুণ ক্রন্দনধ্বনি রাবণের কর্ণে প্রবেশ করিল। পুত্রশোকাতুরা চিত্রাঙ্গদা সখীগণ-পরিবৃতা হইয়া রাজ-সভায় প্রবেশ করিয়া রাক্ষসরাজকে মৃদু ভৎ´সনা করিলেন। করুণ রসের উদ্দীপনে মধুসূদন যে কিরূপ নিপুণ ছিলেন, এই অংশ তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

পুত্রশোকাতুরা চিত্রাঙ্গদাকে সান্ত্বনা দিয়া রাবণ যাহা বলিলেন তাহা রাবণের প্রজাবৎসলতার পরিচায়ক। রাবণ বলিয়াছিলেন,—

> এক পুত্রশোকে তুমি আকুলা ললনে,
> শত পুত্রশোকে বুক আমার ফাটিছে
> দিবা নিশি।

চিত্রাঙ্গদা পুত্রশোকে কাতর হইলেও, তিনি বীরমাতা। তাই তাঁহাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য রাবণ বলিয়াছিলেন যে—স্বাধীনতা রক্ষার জন্য দেশ-বৈরী নাশের মধ্যে অসীম গৌরব বর্তমান। বীরধর্ম সম্বন্ধে, দেশপ্রেমিকের ধর্ম সম্বন্ধে রাক্ষসরাজ রাবণ যে বিশেষ সচেতন ছিলেন তাহা তাঁহার উক্তির মধ্য দিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। অশ্রুপাত এবং বিলাপের দ্বারা বীরধর্ম কলঙ্কিত করা হয়—একথা রাবণ বলিয়াছেন।

কিন্তু রাবণের সেই সান্ত্বনায় চিত্রাঙ্গদার শোকাবেগ কমিল না। বীরাঙ্গনা চিত্রাঙ্গদা পুত্রকে স্বদেশের কল্যাণের জন্য নিহত হইতে দেখিলে সান্ত্বনা লাভ করিতেন সত্য। কিন্তু রাবণের পাপ তৃষ্ণাকে চরিতার্থ করিতে গিয়া নিজের হৃদয়ের ধনকে আহুতি দান করিলে বীরজননীর মন প্রবোধ মানে না। চিত্রাঙ্গদার হৃদয়সর্বস্ব পুত্র বীরবাহু যদি স্বাধীনতার হোমানলে নিহত হইত, তবে তাঁহার বিলাপের কারণ থাকিত না। কিন্তু তাঁহার পুত্র রাবণের অসংযত বাসনানলে উৎসৃষ্ট হইয়াছিল বলিয়া রাবণের সান্ত্বনাবাণীতে চিত্রাঙ্গদার শোকভার লাঘব হইল না। তিনি বলিলেন—

দেশবৈরী নাশে যে সমরে,
শুভক্ষণে জন্ম তার ; ধন্য বলে মানি
হেন বীরপ্রসূনের প্রসূ ভাগ্যবতী।
কিন্তু ভেবে দেখ, নাথ, কোথা লঙ্কা তব ;
কোথা সে অযোধ্যাপুরী ? কিসের কারণে,
কোন্ লোভে, কহ রাজা, এসেছে এদেশে
রাঘব ?..................... ....
...তব হৈমসিংহাসন আশে
যুঝিছে কি দাশরথি ? বামন হইয়া
কে চাহে ধরিতে চাঁদে ? তবে দেশরিপু
কেন তারে বল, বলি ?.........
কে, কহ, এ কাল-অগ্নি জ্বালিয়াছে
আজি লঙ্কাপুরে ? হায়, নাথ, নিজ কর্ম-ফলে,
মজালে রাক্ষসকুল, মজিলা আপনি !

চিত্রাঙ্গদা পতিপরায়ণা, স্নেহপরায়ণা। তাঁহার মধ্যে কোমলতা ও তেজস্বিতার এক অপরূপ সমন্বয় ঘটিয়াছে। রাবণের সান্ত্বনা-বাক্যের উত্তরে তিনি যে মৃদু ভর্ৎসনাবাক্য উচ্চারণ করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার তেজস্বিতার পরিচায়ক।

বাল্মীকি-রামায়ণে এই চিত্রাঙ্গদা চরিত্র নাই। কৃত্তিবাসী রামায়ণে এই চরিত্র শুধুমাত্র উল্লিখিত হইয়াছে, ইহা ফুটিয়া উঠে নাই। কিন্তু মধুসূদন নিপুণ শিল্পীর ন্যায় ইঁহাকে গঠন করিয়া তুলিয়াছেন—ইঁহাকে রূপ দিয়াছেন। ইনি শুধু সন্তানবাৎসল্যে ও পতিপ্রেমে গুণান্বিতা নহেন,—নারীর সুকোমল বৃত্তির সহিত এক অপরূপ তেজস্বিতার সংমিশ্রণ করিয়া মধুসূদন এই চরিত্রটিতে নূতন আলোকপাত করিয়া, ইঁহাকে অপূর্ব মাধুর্যমণ্ডিত করিয়া ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। ইনি পুত্র বীরবাহুর শোকে কাতর। কিন্তু রাজসভায় অধিষ্ঠিত রাবণের মত সম্রাট্‌কে তাঁহার জীবনের ভুল সম্বন্ধে—তাঁহার অন্যায় অধর্মাচরণের সম্বন্ধে সচেতন করিয়া দিতে তিনি কুণ্ঠাবোধ করেন নাই।

কোমলতা ও তেজস্বিতার সমন্বয়ে মধুসূদন আরও কয়েকটি চরিত্র সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। সেরূপ চরিত্র হইতেছে মেঘনাদ-পত্নী প্রমীলার, সেরূপ

চরিত্র বীরাঙ্গনা কাব্যের জনার। সুকোমল সন্তানবাৎসল্যের সহিত বীরত্বের ও তেজস্বিতার মহিমা মিলিত হইয়া জনা চরিত্রটি উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। প্রমীলা পতিগতপ্রাণা নারী—মেঘনাদের ক্ষণমাত্র অদর্শনে তিনি কাতর হইয়া পড়েন। বল্লরীর মত কোমলা তিনি। কিন্তু প্রয়োজনের ক্ষেত্রে এই নারীই বীরাঙ্গনা সাজিয়াছেন। মেঘনাদের যুদ্ধযাত্রাকালে বলিয়াছেন—

ভেবেছিনু, যজ্ঞগৃহে যাব তব সাথে,
সাজাইব বীর সাজে তোমায়।

যে নারী 'দুর্গমের দুর্গ হতে সাধনার ধন' আহরণ করিতে পরাঙ্মুখ নহে—প্রমীলা সেই শ্রেণীর নারী।

কাব্যের প্রথম সর্গে চিত্রাঙ্গদার তিরস্কারে রাবণ স্থির করিয়াছিলেন যে, অতঃপর তিনি আর কোন পুত্রকে যুদ্ধে পাঠাইবেন না, নিজেই যুদ্ধযাত্রা করিবেন।—

"এত দিনে" (কহিলা ভূপতি)
"বীরশূন্য লঙ্কা মম! এ কাল-সমরে,
আর পাঠাইব কারে? কে আর রাখিবে
রাক্ষস-কুলের মান? যাইব আপনি।
সাজ হে বীরেন্দ্রবৃন্দ, লঙ্কার ভূষণ!
দেখিব কি গুণ ধরে রঘুকুলমণি!"

অনন্তর যুদ্ধসজ্জা হইতে লাগিল। তাহারই বিক্ষোভে বরুণপত্নী বারুণীর মুক্তাময়ী গৃহচূড়া কাঁপিতে লাগিল। ইহাতে বারুণী কৌতূহলী হইয়াছেন এবং মুরলাকে জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া জানিতে পারিয়াছেন যে, রাবণের যুদ্ধ-সজ্জাহেতু জলস্থল আজ কাঁপিয়া উঠিয়াছে।

এই বারুণী চরিত্রটি বিদেশী কাব্য হইতে মেঘনাদবধ কাব্যে অনুকৃত। হোমারের থেটিস হইতে কবি মিলটন তাঁহার কোমাস (Comus) কাব্যের স্যাব্রিনা (Sabrina) চরিত্রটি সৃষ্টি করেন। মধুসূদনের এই বারুণী চরিত্র মিলটনের স্যাব্রিনার আদর্শে পরিকল্পিত। বারুণীর সখী মুরলার নাম কবি উত্তররামচরিত হইতে গ্রহণ করিয়াছেন।

কাব্যের প্রথম সর্গে মেঘনাদের সহিত আমাদের সাক্ষাৎকার ঘটে। কাব্যের প্রথম সর্গেই মেঘনাদ বীর, তিনি দেশপ্রেমিক, কর্তব্যে সচেতন,

গভীর আত্মপ্রত্যয়শীল। সাধ্বী পত্নীর প্রতি অসীম তাঁহার প্রেম, পিতার প্রতি ভক্তি তাঁহার গভীর। এই মেঘনাদের বীরত্বে ও শক্তিতে সকলের আস্থা। ইনি যুদ্ধের ভার গ্রহণ করিলে লঙ্কাপুরী হইতে নৈরাশ্যের অন্ধকার কাটিয়া যায়, আশায়-আনন্দে লঙ্কা পরিপূর্ণ হইয়া উঠে, দেবকুল তখন সচকিত হন—রাঘবপক্ষে জয় সম্বন্ধে সংশয় উপস্থিত হয়। এই মেঘনাদ কাব্যমধ্যে দৈবী-শক্তি বা অতিপ্রাকৃত শক্তির সহায়তায় যুদ্ধ করেন নাই। বীরত্ব তাঁহার স্বাভাবিক প্রাণধর্ম। ইন্দ্রজিৎ যে কবির 'favourite', সে পরিচয় মেঘনাদবধ কাব্যের প্রথম হইতে আরম্ভ করিয়া ষষ্ঠ সর্গ,—অর্থাৎ 'মেঘনাদের বধ' পর্যন্ত পরিস্ফুট হইয়া আছে। কাব্যের প্রথম সর্গেই মেঘনাদের যে পরিচয় আমরা পাই, উহাতেই তাঁহার চরিত্রের প্রায় সবটুকু প্রকাশ পাইয়াছে। কেবল ষষ্ঠ সর্গে মৃত্যুর পূর্বক্ষণে তাঁহার মধ্যে অতিথি-সেবাজ্ঞান, শাস্ত্রজ্ঞান ও ধর্মজ্ঞানের পরিচয়টুকু সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়া চরিত্রটিকে পূর্ণতা দান করিয়াছে।

রাবণ যুদ্ধযাত্রার জন্য উদ্যোগী হইলে লঙ্কার রাজলক্ষ্মী মেঘনাদের ধাত্রী প্রভাষার রূপ ধরিয়া মেঘনাদের প্রমোদোদ্যানে উপস্থিত হইয়াছেন এবং তাঁহাকে বীরবাহুর নিধনসংবাদ জানাইয়াছেন। ধাত্রী প্রভাষার মুখে লঙ্কার দুরবস্থা শুনিয়া মেঘনাদের অন্তর আক্ষেপে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। তিনি তাঁহার কণ্ঠের পুষ্পমালা ছিন্ন করিয়া যুদ্ধযাত্রার জন্য উদ্যোগী হইয়া বলিয়াছেন—

ধিক মোরে! বৈরীদল বেড়ে
স্বর্ণলঙ্কা, হেথা আমি বামাদল মাঝে?
এই কি সাজে আমারে? দশাননাত্মজ
আমি ইন্দ্রজিৎ; আন রথ ত্বরা করি;
ঘুচাব এ অপবাদ বধি' রিপুকুলে।

মেঘনাদ প্রমোদোদ্যানে সুখবিলাসে মগ্ন ছিলেন। কিন্তু কর্তব্যের আহ্বান আসিতেই তিনি সুখবিলাস ত্যাগ করিয়া লঙ্কার অভিমুখে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন।

এই সময়ে তাঁহার পত্নী প্রমীলা স্বামীকে বিদায় দিতে বিরহে কাতর হইয়া পড়িয়াছেন। প্রমীলার চরিত্র এখানে স্নিগ্ধ সৌন্দর্যে উদ্ভাসিত।

কিন্তু তৃতীয় সর্গে ইনিই বীরাঙ্গনা, স্বামীর সহিত মিলনের অধীরতায় সেখানে তিনি তেজস্বিনী।

প্রথম সর্গে বিরহকাতরা প্রমীলাকে সান্ত্বনা দিয়া মেঘনাদ যুদ্ধযাত্রা করিয়াছেন। আপন শক্তির উপর বিশ্বাস ছিল বলিয়া প্রমীলাকে তিনি যাত্রার প্রাক্কালে বলিয়া গেলেন—

ত্বরায় আমি আসিব ফিরিয়া
কল্যাণি, সমরে নাশি তোমার কল্যাণে
রাঘবে। বিদায় এবে দেহ, বিধুমুখি।

প্রমীলার নিকট হইতে বিদায় লইয়া নির্ভীক মেঘনাদ রাবণের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছেন এবং পিতার কাছে যুদ্ধের সেনাপতিত্ব প্রার্থনা করিয়াছেন। পিতাকে তিনি যুদ্ধযাত্রা হইতে নিবৃত্ত হইতে অনুরোধ জানাইয়াছেন। কিন্তু পুত্রের অমঙ্গল আশঙ্কায় রাবণের অন্তর কাতর হইয়াছে। তাঁহারই জন্য যুদ্ধে কুম্ভকর্ণ বলী প্রাণ দিয়াছে, পুত্র বীরবাহুর মৃত্যু হইয়াছে। এক এক করিয়া পুত্র-পরিজনের মৃত্যু দেখিয়া মেঘনাদকে যুদ্ধে পাঠাইবার ভরসা রাবণ পাইতেছিলেন না। তাই তিনি বলিলেন—

এ কাল সমরে
নাহি চাহে প্রাণ মম পাঠাইতে তোমা
বারম্বার। হায়! বিধি বাম মোর প্রতি।

রাবণের চিত্র এখানে বড়ই করুণ। মানবহৃদয়ের মোহময় দুর্বল দিকটি রাবণের এই উক্তির মধ্য দিয়া ব্যক্ত হইয়াছে। পুত্র-পরিজনের বিয়োগ-ব্যথায় তিনি মুহ্যমান। রাবণচরিত্রের বিশেষত্বই এইখানে। বীরত্বের দীপ্তচ্ছটার সহিত স্নেহবিহ্বলতা মিলিত হইয়া তাঁহার চরিত্র একটি স্নিগ্ধ শ্রীতে মণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছে।

পুত্রকে যুদ্ধে পাঠাইতে অনিচ্ছা রাবণের ছিল। কিন্তু পুত্রের একান্ত সমরাভিলাস দর্শনে লঙ্কাপতি কুমার মেঘনাদকে যথাবিধি সেনাপতিত্বে অভিষিক্ত করিয়াছেন। বীর মেঘনাদের অভিষেকে লঙ্কার পুরপ্রাচীরের মধ্যে চারিদিকে আশা উৎসাহ ও আনন্দের প্রবাহ বহিয়াছে। এইখানে এ কাব্যের প্রথম সর্গ সমাপ্তি লাভ করিয়াছে।

মেঘনাদবধ কাব্যের দ্বিতীয় সর্গের নাম ‘অস্ত্রলাভ’। মেঘনাদের বধের

নিমিত্ত লক্ষ্মণের অস্ত্রলাভ এই সর্গের বর্ণনীয় বিষয়। স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্রের সহায়তায় লক্ষ্মণের অস্ত্রলাভ হইয়াছে। এই সর্গের ঘটনাবলী স্বর্গলোকে ঘটিয়াছে এবং এই সর্গে আমরা কেবল দেবলোকের দেব-দেবীর সহিতই সাক্ষাৎকার লাভ করি। মহাকাব্যের কবির কল্পনা স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল-প্রসারী হইয়া থাকে। সেই হেতু মধুসূদনের কল্পনা কেবল মর্ত্যভূমিতেই বিচরণ করিয়া ফিরে নাই, কবির কল্পনা দেবলোকেও বিস্তৃত হইয়াছে। এ কাব্যের অষ্টম সর্গে তাঁহার কল্পনা পাতালপুরীতেও প্রসারিত হইয়াছে।

মেঘনাদবধ কাব্যের দ্বিতীয় সর্গের ঘটনা রামায়ণ-বহির্ভূত। রামায়ণে দেবতাগণ প্রত্যক্ষভাবে রাঘবপক্ষে সহায়তা করেন নাই। কিন্তু মেঘনাদবধ কাব্যের এই সর্গে দেবদেবীগণ প্রত্যক্ষভাবেই লঙ্কাযুদ্ধকালে রামের সহায়তা করিয়াছেন দেখিতে পাই। গ্রীক কবি হোমারের ইলিয়াডের আদর্শে মধুসূদন দেব-দেবীদিগকে বিবদমান্ দুই পক্ষে সাহায্যকারী করিয়াছেন। দেবতাগণকে এইভাবে বিবদমান্ দুই পক্ষে সাহায্যকারিরূপে কল্পনা করা গ্রীক রীতি। সেই রীতি অনুসারে এই সর্গে মধুসূদন তাঁহার কল্পনা ও বর্ণনাকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছেন।

সর্গের প্রারম্ভে দেবরাজ ইন্দ্র স্বর্গরাজ্যে আপন সভায় উপবিষ্ট। এমন সময় রক্ষঃকুল-রাজলক্ষ্মী ইন্দ্রের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া মেঘনাদের সেনাপতিপদে অভিষেক-বার্তা এবং মেঘনাদ-কর্তৃক নিকুম্ভিলা যজ্ঞানুষ্ঠানের কথা বলিলেন। মেঘনাদ নিকুম্ভিলা যজ্ঞ সমাপন করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে 'দেবকুলপ্রিয়' রামকে রক্ষা করা অসম্ভব হইবে, ইহা উপলব্ধি করিয়া দেবরাজ ইন্দ্র শচীকে সঙ্গে লইয়া কৈলাসে পার্বতীর নিকট গমন করিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র ও শচীদেবীর প্রার্থনায় এবং রামচন্দ্রের পূজায় সন্তুষ্ট হইয়া পার্বতীর হৃদয় বিগলিত হইল। সুতরাং ধ্যানলীন মহাদেবের ধ্যানভঙ্গ করিয়া রাঘবপক্ষের জয়কে সুনিশ্চিত করিবার জন্য,—'দেবদৈত্যনর-ত্রাস' মেঘনাদের বধের উপায় জানিবার জন্য, পার্বতী যোগাসন-শৃঙ্গে গমন করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। মদনপ্রিয়া রতি পার্বতীর মনোরম বেশভূষা করিয়া দিলেন। মোহিনী মূর্তিতে পার্বতী মহাদেবের ধ্যানভঙ্গ করিবার জন্য কামদেবকে সঙ্গে লইয়া যোগাসন নামক শৃঙ্গের উদ্দেশ্যে গমন করিলেন। মহাদেব সেখানে তপোমগ্ন ছিলেন।

পার্বতীর অভিলাষ সিদ্ধ হইল। মহাদেবের নির্দেশমত মায়াদেবীর কাছ

হইতে ইন্দ্রদেব লক্ষ্মণের জন্য অজেয় অস্ত্র লাভ করিলেন। মেঘনাদের বধে লক্ষ্মণের প্রত্যক্ষ সহায়তার প্রতিশ্রুতি দিয়া মহাদেব ইন্দ্রকে নিশ্চিন্ত করিলেন।

গ্রীক পুরাণকাহিনী এবং কালিদাসের কুমারসম্ভবের হরপার্বতীর কাহিনী মিলাইয়া মেঘনাদবধ কাব্যের দ্বিতীয় সর্গটি রচিত। কিন্তু মেঘনাদবধ কাব্যের এই দ্বিতীয় সর্গ রচনায় মধুসূদনের কবিমানস গ্রীক পুরাণের দিকেই বেশী ঝুঁকিয়াছে। কবির আকাঙ্ক্ষা ছিল, গ্রীক পুরাণের উৎকৃষ্ট অংশসকল বঙ্গ-সাহিত্যে প্রবর্তন করার,—It is my ambition to engraft the exquisite graces of Greek mythology on our own.

এই আকাঙ্ক্ষাই কবিকে গ্রীক পুরাণের জুনো-জুপিটারের কাহিনীর আদর্শে দ্বিতীয় সর্গের হর-পার্বতীর কাহিনী রচনার প্রেরণা দিয়াছিল। এই সর্গের প্রধান দেব-দেবী হরপার্বতী, কিন্তু হরপার্বতীর স্বরূপ এবং প্রকৃতি গ্রীক পুরাণকাহিনী অনুসারে কবি অঙ্কিত করিয়াছেন। কবি তাঁহার এ সর্গের কাহিনী ইলিয়াড্ কাব্য হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে কবির নিজেরই একটি উক্তি উল্লেখযোগ্য :

As a reader of Homeric epos you will no doubt be reminded of the Fourteenth Iliad—of Juno's visit to Jupiter on Mount Ida.

গ্রীক পুরাণকাহিনী অনুসরণ করায়, মেঘনাদবধ কাব্যের দ্বিতীয় সর্গে ভারতীয় পুরাণ ও কাব্যবর্ণিত মহাসংযমী মহাদেব ও তপশ্চারিণী পার্বতী ইলিয়াডের জুনো-জুপিটারের মত কামপরতন্ত্র হইয়া উঠিয়াছেন। পার্বতী এই সর্গমধ্যে যেভাবে মোহিনী মূর্তি ধারণ করিয়া ধ্যানমগ্ন মহাদেবের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছেন, তাহাতে তাঁহার চরিত্র হীন হইয়াছে। মহাদেব যেরূপ সহজে কামদেবের পুষ্পশরের আঘাতে প্রেমামোদে মাতিয়া উঠিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার চরিত্রের গাম্ভীর্য এবং শুচিতা ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। কালিদাসের হরপার্বতীর উন্নতভাব ও মহান্ চিত্র মধুসূদন রক্ষা করিতে পারেন নাই।

যে গ্রীক কাহিনীটি মধুসূদন অনুসরণ করিয়াছিলেন, তাহা এইরূপ : গ্রীক মহাদেবী জুনোর একান্ত ইচ্ছা, ট্রয়-যুদ্ধে তাঁহার ভক্ত গ্রীকগণ ট্রোজানদিগকে পরাজিত করে। কিন্তু ভক্তবৎসল মহাদেব জুপিটার প্রসন্ন থাকিতে দেব কি দানব কাহারও দ্বারা ট্রোজানদিগের কোনরূপ অনিষ্টের বা পরাজয়ের কোন আশঙ্কা বা সম্ভাবনা ছিল না। জুনো সেইজন্য স্বীয় পতিকে মোহিনী-

মূর্তিতে বিমোহিত করিয়া স্বীয় কার্যোদ্ধার করিতে মনস্থ করিলেন। তিনি গ্রীক-রতি আফ্রোদিতির সহায়তায় মোহিনী-মূর্তিতে সাজিলেন। তারপর তিনি অলিম্পাস পর্বত হইতে আইডা পর্বতের উদ্দেশ্যে গমন করিলেন—পথে নিদ্রাদেব সমনসকে সঙ্গে লইলেন। সমনস কামদেবের মতই মহারুদ্র জুপিটারের সম্মুখে যাইতে ভীত হইয়াছিলেন। কিন্তু জুনো তাঁহাকে অভয়দান করিলে উভয়ে মেঘাবৃত আকাশপথে অলক্ষ্যে যাত্রা করিলেন। জুপিটারের সন্নিধানে পৌঁছিয়া জুনো তাঁহাকে প্রেমালিঙ্গনে বদ্ধ করিলে, সমনস আপন শক্তিপ্রয়োগে জুপিটারকে গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত করিয়া দিলেন। অতঃপর জুনো ট্রোজানদিগের পরাজয়ের মর্ম অবগত হইলেন।

ইলিয়াডের এই আখ্যায়িকার সহিত মধুসূদন কুমারসম্ভব কাব্যান্তর্গত হরপার্বতীর কাহিনী মিশাইয়াছেন। সেইজন্যই কুমারসম্ভবের মহোচ্চ আদর্শ মধুসূদনের কাব্যে ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। কুমারসম্ভবে মহাদেবের চিত্র মহান্। সেখানে শিবকে পতিরূপে লাভ করিবার জন্য পার্বতী ধ্যানরত শিবের পদতলে অর্ঘ্য আনয়ন করিয়াছেন। সেই সময়ে কন্দর্প পার্বতীর অজ্ঞাতসারে শিবের চিত্ত বিগলিত করিতে চেষ্টা করিয়াছে। ইহাতে কামনা-বাসনার প্রতীক কন্দর্প ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। অতঃপর পার্বতী তপস্যাবলে নিজের দেহগত রূপ-লাবণ্যকে ধ্বংস করিয়া আধ্যাত্মিক রূপলাবণ্যে সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিলেন। দুঃখের রুদ্রবহ্নি হইতে প্রেম জলদর্চি তনু গ্রহণ করিল,—মহাদেবের সহিত পার্বতীর মিলন হইল।

কালিদাস দেখাইয়াছেন, ভোগবাসনার মধ্য দিয়া শিবকে পাওয়া যায় না, যেখানে বাসনার চাঞ্চল্য, প্রেমের ও সৌন্দর্যের সার্থকতা সেখানে ঘটে না। তপস্যা ও কৃচ্ছ্রসাধনের মধ্য দিয়া, অঙ্গের লাবণ্য ক্ষয় করিয়া, অধ্যাত্ম-সৌন্দর্যে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়া তবে শিবকে লাভ করিতে হয়।

কালিদাস তাঁহার কুমারসম্ভব কাব্যে প্রেম-সৌন্দর্যের যে চিত্র আঁকিয়াছেন, তাহা সংযমের শুভ্রশ্রীমণ্ডিত। দুর্নিবার দুরন্ত প্রেম-সৌন্দর্য সেখানে সংযত হইয়াছে, পরমস্তব্ধতা লাভ করিয়াছে। দেহজ রূপসৌন্দর্যকে কালিদাস স্বীকার করিয়াছেন, তাহার আকর্ষণ ও পরিণামকেও দেখাইয়াছেন। কিন্তু কাব্য-মধ্যে তাহাকে সর্বস্ব করেন নাই। কালিদাসে বেদনার তপস্যার কথা প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। ঐহিক চাঞ্চল্য অনৈহিক চেতনায় মণ্ডিত হইয়াছে।

কালিদাস দেখাইয়াছেন,—কঠিন দুঃখ ও দুঃসহ বেদনা দ্বারা যে মিলন সংসাধিত হয় তাহাই শাশ্বত মিলন। উহাই ভারতীয় প্রেম-সৌন্দর্যের আদর্শ। যেখানে কেবল আসক্তির তৃষ্ণা বা বাসনার উদ্দামতা—ভারতীয় কল্পনায় প্রেম ও সৌন্দর্য সেখানে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইতে বাধ্য। ভারতীয় কবিগণের দৃষ্টিতে প্রেম ও সৌন্দর্য সাধনার ফল, দুশ্চর তপস্যার পরে মিলনের সার্থকতা। তাই কুমার-সম্ভবে উমার কামনায় নহে, উমার সাধনায় মহাযোগীর ধ্যানভঙ্গ হয়। দুষ্মন্ত-শকুন্তলার মিলন কণ্বের আশ্রমে পরিপূর্ণতা লাভ করে না, উভয়ের মিলন সার্থক হয় মারীচের তপোবনে,—যেখানে বাসনার চাঞ্চল্য নাই, ঐহিক প্রেম যেখানে অনৈহিকতায় উজ্জলরূপ ধারণ করিয়াছে, সেখানে দুষ্মন্ত-শকুন্তলার মিলন সার্থক হইয়াছে।

বৈষ্ণব কবিতাতেও ইহাই পরিলক্ষিত হইয়াছে। বৈষ্ণব কবিতায় শ্রীরাধিকার মূর্তি যোগিনী মূর্তি,—"বিরতি আহারে, রাঙা বাস পরে, যেমতি যোগিনী পারা!" সেখানে দুঃখের তাপে, বিরহের আগুনে দগ্ধ হইয়া তবে রাধাকৃষ্ণের মিলন হইয়াছে,—তাহাই সার্থক মিলন। কিন্তু মেঘনাদবধ কাব্যের দ্বিতীয় সর্গে মধুসূদন হরপার্বতীর যে চিত্র আঁকিয়াছেন, তাহা এই আদর্শের অনুবর্তী হয় নাই।

পাশ্চাত্ত্য সৌন্দর্যকল্পনার শেষ কথা Beauty। উহা বহিঃসৌন্দর্য বা দেহগত সৌন্দর্য হইলেও আপত্তি নাই। কিন্তু ভারতীয় কল্পনায় প্রেম ও সৌন্দর্য—

যেন মলয়জ ঘষিতে শীতল, অধিক সৌরভময়!

প্রেম ও সৌন্দর্য সম্পর্কে মধুসূদনের এরূপ বোধ ছিল না বলিয়াই মেঘনাদবধ কাব্যের দ্বিতীয় সর্গে কবি গ্রীক ও ভারতীয় সৌন্দর্যচেতনার সমন্বয়সাধন করিতে পারেন নাই। পাশ্চাত্ত্য সৌন্দর্যচেতনার অনুসরণ করায় সর্গটির মধ্যে রসাভাস ঘটিয়াছে।

মেঘনাদবধ কাব্যে মধুসূদন যে-সকল চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহারা বাল্মীকি-কৃত্তিবাসের অঙ্কিত চরিত্রের প্রতিরূপ নহেন। কবি তাঁহাদিগকে স্বকীয় স্বপ্নে দেখিয়াছেন এবং আপন কল্পনার রঙে আঁকিয়া তুলিয়াছেন। দেবদেবীর চরিত্রাঙ্কন বিষয়েও তিনি ভারতীয় কল্পনার অনুবর্তী হন নাই। এইজন্যই মেঘনাদবধ কাব্যের হরপার্বতীর চরিত্র কালিদাসের সৃষ্টি হইতে ভিন্নরূপ ধারণ করিয়াছে।

মেঘনাদবধ কাব্যের পার্বতী যেন বাংলা মঙ্গলকাব্যের চণ্ডী হইয়া পড়িয়াছেন। ভক্তের প্রার্থনা-পূরণকারিণী ও মঙ্গলকারিণী দেবীরূপে যে চণ্ডীর সহিত আমরা মঙ্গলকাব্যে সাক্ষাৎকার লাভ করি, সেই দেবীর সমপর্যায়ভুক্ত হইয়া পড়িয়াছেন মেঘনাদবধ কাব্যের পার্বতী। এ কাব্যে পার্বতীর মধ্যে পৌরাণিক দেবতার মহিমা নাই, লৌকিক দেবতার স্তরে তিনি নামিয়া আসিয়াছেন।

চরিত্রসৃষ্টি বিষয়ে মধুসূদন প্রায়শই পাশ্চাত্ত্য আদর্শের অনুসরণ করিয়াছেন, এবং এজন্য তিনি লৌকিক সংস্কারকে অগ্রাহ্যও করিয়াছেন। চরিত্রসৃষ্টি-ব্যাপারে, বিশেষত চরিত্রবিশেষ যেখানে কোন একটি বিশেষ ভাবের প্রতীক, সেখানে লৌকিক সংস্কারকে অগ্রাহ্য করিবার অধিকার কবিমাত্রেরই আছে। মেঘনাদবধ কাব্যের রাবণ-চরিত্র অঙ্কন করার বেলায়, এই অধিকার গ্রহণ করায় উহা কাব্যের উৎকর্ষবিধায়কই হইয়াছে। কিন্তু কোনও সংস্কার যখন আমাদের জীবনের সহিত নিবিড়ভাবে জড়িত, অন্তরের ধ্যানধারণায় গভীরভাবে মুদ্রিত,—সেখানে সংস্কারকে অগ্রাহ্য করিলে, তাহা কাব্যের অনুৎকর্ষবিধায়কই হইয়া থাকে। হরপার্বতীর এক অতি উজ্জ্বল চিত্র আমাদের মনে চিরকালের জন্য মুদ্রিত হইয়া আছে। তাঁহারা সংযত প্রেমের আদর্শস্বরূপ। যে গৌরী স্বীয় দৈহিক সৌন্দর্যকে ধিক্কৃত করিয়া তপস্যা দ্বারা আপন সৌন্দর্যকে সার্থক করিয়া তুলিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন, মধুসূদনের কাব্যে তিনি স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য আপনার রূপ-লাবণ্যকে পণ্যসামগ্রীর মত করিয়া তুলিয়াছেন। যে মহাদেবের সংযম মদনের বাণে ভাঙে নাই, বরং মদনই মহাদেবকে বিচলিত করিতে গিয়া ধ্বংস হইয়াছেন,—মধুসূদনের কাব্যে সেই মহাদেব পার্বতীর দেহলাবণ্যেই আকৃষ্ট হইয়াছেন,—মদনের দ্বারা তিনি নির্জিত হইয়াছেন। ইহার কারণ, মধুসূদনের হরপার্বতী ছদ্মনামে জুনো-জুপিটার। বাংলা সাহিত্যে চরিত্রসৃষ্টি প্রভৃতির নূতন আদর্শ প্রবর্তন করিতে হইবে—এই প্রেরণাবশে কবি জুনো-জুপিটারের অনুরূপ করিয়া হরপার্বতীর চরিত্রাঙ্কনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তাই এইরূপ হইয়াছে।

কিন্তু কবি বোধ হয় পাশ্চাত্ত্য আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া এই দেবচরিত্র দুইটিকে অঙ্কন করিয়া আপন ভুলটুকু বুঝিতেও পারিয়াছিলেন, এবং ভুল বুঝিয়াই কুণ্ঠিত হইয়া বোধ হয় শেষ পর্যন্ত লক্ষ্য করিয়াছেন যে চন্দ্রমৌলীর ভালে—

লজ্জাবেশে রাহু আসি' গ্রাসিল চাঁদেরে !

মেঘনাদবধ কাব্যের তৃতীয় সর্গের নাম—'সমাগম'। মেঘনাদের সহিত প্রমীলার মিলন-বর্ণনা এই সর্গের উদ্দেশ্য। প্রেমের দুর্জয় শক্তি এই সর্গে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে।

এই সর্গে প্রমীলার লঙ্কাপ্রবেশ বর্ণিত হইয়াছে। প্রথম সর্গে প্রমোদ উদ্যানে প্রমীলার নিকট হইতে বিদায়-গ্রহণকালে মেঘনাদ বলিয়া গিয়াছিলেন—

ত্বরায় আমি আসিব ফিরিয়া
কল্যাণি, সমরে নাশি' তোমার কল্যাণে
রাঘবে।

কিন্তু স্বামীর প্রত্যাবর্তনের বিলম্ব দেখিয়া প্রমীলা এই সর্গের প্রথমে অত্যন্ত অধীরা হইয়াছেন এবং নিশ্চেষ্ট হইয়া মনের আবেগকে মনের মধ্যে পোষণ করা প্রমীলার প্রকৃতি ছিল না বলিয়া, তিনি স্বামীর সহিত মিলনের জন্য আত্মশক্তির উপর নির্ভর করিয়াই 'অলঙ্ঘ্য সাগর সম রাঘবীয় চমূ'র বেষ্টনী ভেদ করিয়া লঙ্কায় উপনীত হইয়াছেন।

প্রমীলা কুলবধূর আদর্শ, কিন্তু কুলবধূর কোমলতার সহিত বীরাঙ্গনার তেজস্বিতা মিলিত করিয়া মধুসূদন এই চরিত্রটিকে আঁকিয়া তুলিয়াছেন। কাব্যের প্রথম সর্গে প্রমীলা করুণকোমলা কুলবধূ। কুলবধূর স্নিগ্ধতায় তিনি কমনীয়, সুষমায় রমণীয়। স্বামীকে ঘিরিয়াই তাঁহার যত শখ সাধ আশা। সেখানে তাঁহার সকল আকাঙ্ক্ষা,কামনা-বাসনা তিনি স্বামীর উদ্দেশ্যেই অঞ্জলিদান করিয়াছেন। তাই ইন্দ্রজিতের যুদ্ধযাত্রার কথা শুনিয়া তিনি কুলবধূর মতই অসহায় বোধ করিয়াছেন—যুদ্ধার্থে স্বীয় পতিকে বিদায় দিতে অনিচ্ছুক হইয়া অশ্রুমতী প্রমীলা সেখানে বলিয়াছেন—

কোথা প্রাণসখে,
রাখি এ দাসীরে, কহ, চলিলা আপনি ?
কেমনে ধরিবে প্রাণ তোমার বিরহে
অভাগী !

স্বামীর সহিত মুহূর্তের বিচ্ছেদ-সম্ভাবনায় তিনি কাতরা হইয়া পড়েন।

তৃতীয় সর্গের প্রারম্ভেও প্রমীলার সেই করুণকোমলা বধূমূর্তিটিই ফুটিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু লঙ্কাপুরীতে অবস্থিত স্বামীর সহিত মিলনের সঙ্কল্পে তাঁহার

তেজ এবং দৃঢ়তার প্রকাশ দেখা গিয়াছে। তখন তিনি আর অসহায়া নহেন, দুর্জয় শক্তির অধিকারিণী নারী তিনি।

প্রমীলাচরিত্রের মূল প্রেরণা প্রেম। প্রেমের অনুরোধে কখনও তিনি করুণকোমলা কুলবধূর মূর্তিতে দেখা দিয়াছেন, আবার প্রেমের বশে তিনিই বীরাঙ্গনা মূর্তিতে প্রতিভাত হইয়াছেন। কখনও তাঁহাকে আমরা দেখি—

প্রমোদ উদ্যানে কাঁদে দানব-নন্দিনী
প্রমীলা, পতি-বিরহে কাতরা যুবতী।
অশ্রু-আঁখি বিধুমুখী ভ্রমে ফুলবনে
কভু।

আবার কখনও এই অধীরা বধূকেই আমরা বলিতে শুনি—

পশিব লঙ্কায় আজি নিজ ভুজবলে,
দেখিব কেমনে মোরে নিবারে নৃমণি!

রুদ্রতার মধ্যে কোমলতার স্পর্শটুকু থাকিয়া এই চরিত্রটি অনিন্দ্যসুন্দর লাবণ্যে ভাস্বর হইয়া উঠিয়াছে। মহাভারতের প্রমীলার মতই ইনি মুহূর্ত-মধ্যে বধূবেশ পরিত্যাগ করিয়া যুদ্ধসাজে সাজিয়া উঠিতে পরাঙ্মুখ হন না। তিনি মহাভারতের প্রমীলার মতই প্রয়োজনের ক্ষেত্রে—"অবলা প্রবলা হয়ে ধরে ধনুঃশর"।

ইউরোপীয় সাহিত্যে বীরাঙ্গনার চিত্র বহু আছে। ইতালীয় কবি ট্যাসোর জেরুজালেম ডেলিভার্ড কাব্যের ক্লরিণ্ডা, গিল্ডিপ বা আর্মিনিয়া, ভার্জিলের ইনিড কাব্যের ক্যামিলা, হোমারের এথেনী, বায়রনের মেড্ অব সারাগোসা—সকল চরিত্রই বীরাঙ্গনার তেজে তেজস্বিনী,—এবং প্রমীলা চরিত্র-সৃষ্টিতে উল্লিখিত সকল কবির কাব্যান্তর্গত চরিত্রই মধুসূদনের আদর্শ হইয়াছিল। কিন্তু প্রমীলা চরিত্রের গঠনপ্রণালী মধুসূদনের নিজস্ব। কারণ, ইউরোপীয় কাব্যসমূহের অন্তর্গত বীরাঙ্গনা-চিত্রে আমরা শুধু রুদ্র ভাবেরই পরিচয় পাই। কখনও তাঁহাদিগকে আমরা অশ্বারোহণে পলায়নপরা দেখি, কখনও সমরাঙ্গনে রণোন্মত্ত দেখি। কিন্তু গৃহবধূর কোমলতা, রমণীর ব্রীড়াবনত সলজ্জ ভাব তাঁহাদের মধ্যে পাওয়া যায় না। কুলবধূর কোমলতা, তাহার ব্রীড়াবনত মাধুরীর সহিত বীরাঙ্গনার রুদ্রতেজ বা দীপ্তির যে সমন্বয় হইতে পারে, ইহা ইউরোপীয় কল্পনার অতীত। একমাত্র ভারতীয় কল্পনায় এইরূপ রুদ্রতার

সহিত কোমলতার মিলন সম্ভব। ভারতীয় কল্পনাতেই আমরা পাই—'পর্যাপ্ত-পুষ্পস্তবকাবনম্রা পল্লবিনী লতেব' কোমলাঙ্গী গৌরী, আবার কঠোর ব্রতপরায়ণা 'অপর্ণা কপালমালিনী খর্পরধারিণী শূলধরা'। মধুসূদনের কল্পনায় এইরূপ নারীমূর্তির উদ্ভব হইয়াছে। প্রমীলাচরিত্র সৃষ্টির পিছনে পাশ্চাত্ত্যের আদর্শ বা প্রেরণা থাকিলেও, এ চরিত্রসৃষ্টিতে মধুসূদন ভারতীয় সংস্কারকেই অক্ষুণ্ন রাখিয়াছেন।

মধুসূদনের মেঘনাদবধ কাব্য বিষাদান্তক কাব্য। রাবণের করুণ বিলাপে এই কাব্যের আরম্ভ এবং বীর মেঘনাদের মৃত্যুতে ও প্রমীলার সহমরণে এ কাব্যের সমাপ্তি। প্রমীলার সেই বিষাদময় পরিণতিকে করুণ করিয়া তুলিবার জন্য তৃতীয় সর্গে কবি এই চরিত্রটিকে এমন উজ্জ্বল করিয়া চিত্রিত করিয়াছেন।

প্রমীলা একনিষ্ঠ প্রেমের চিত্র। বীরত্বে এ চরিত্র আমাদিগকে বিস্মিত করিয়াছে, কোমলতায় মুগ্ধ করিয়াছে। কোমলতায় ও বীরত্বে প্রমীলা মানবী, কিন্তু শেষ সর্গে আত্মবিসর্জনে তিনি দেবী। পাশ্চাত্ত্য বীরাঙ্গনাদিগের মত যুদ্ধ করিয়া তিনি মৃত্যুবরণ করেন নাই, স্বামীর সহিত তিনি সহমৃতা হইয়াছেন। ইহাতেও চরিত্রটি ভারতের মাটির ফুলই হইয়াছে, বিজাতীয় হয় নাই। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'মহুয়া' কাব্যে যে নারীকে দিয়া বলাইয়াছেন—

রুক্ষ দিনের দুঃখ পাই তো পাবো
চাই না শান্তি, সান্ত্বনা নাহি চাবো।

প্রমীলা সেই শ্রেণীর নারী।

প্রমীলা শুধু পত্নী নহেন, তিনি কল্যাণী। তাঁহার কল্যাণদীপ্ত প্রেম ইন্দ্রজিৎকে দেশহিতে যুদ্ধযাত্রায় পরিচালিত করিয়াছে, মহৎ কর্তব্যে নিয়োজিত করিয়াছে। প্রমীলার প্রেমই মেঘনাদের দুর্দম, দুর্জয় শক্তিকে সংহত সুসংবদ্ধ করিয়াছে, সঙ্কটের মুহূর্তে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবার শক্তি দিয়াছে। প্রমীলার প্রেম কেবল প্রমীলাকেই গৌরবময়ী করিয়া তুলে নাই, ইহা মেঘনাদের অভ্রভেদী পৌরুষের ভিত্তিভূমি রচনা করিয়াছিল।

মেঘনাদবধ কাব্যের চতুর্থ সর্গের নাম 'অশোকবন'। এই সর্গের মধ্যে 'একাকিনী শোকাকুলা' সীতার আশা-আশঙ্কা, ব্যথা-বেদনা বর্ণিত হইয়াছে। মূর্তিমতী পবিত্রতার চারিত্রিক মাধুর্যের স্নিগ্ধচ্ছটা সমস্ত সর্গটিকে দীপ্ত করিয়া

তুলিয়াছে। সর্গটির মধ্য দিয়া একটা করুণরসের ধারা এমনভাবে বহিয়া গিয়াছে যে, সর্গ শেষ হইয়া যায়—তবু রহিয়া যায় একটি বিষাদের রেশ। বিরহকাতরা সীতার আতপ্ত হৃদয়ের আর্তিভরা দীর্ঘশ্বাসের রেশটুকু এই চতুর্থ সর্গ পাঠ শেষ করিয়াও মিলাইয়া যায় না।

এই সর্গে সীতা ও সরমার কথোপকথনের সূত্রে কবি রামের বনবাস-জীবন হইতে আরম্ভ করিয়া সীতার উদ্ধার-সাধন পর্যন্ত রামায়ণের অতীত ও ভবিষ্যৎ কাহিনীর অবতারণা করিয়াছেন। দণ্ডকারণ্যে রাম-সীতার সুখময় জীবন-যাপন, স্বর্ণমৃগের প্রলোভন দেখাইয়া রাবণকর্তৃক সীতাহরণ, জটায়ুবধ, সুগ্রীবের সহিত রামের মিলন, সমুদ্রে সেতুবন্ধন প্রভৃতি বিষয় চতুর্থ সর্গে বর্ণনা করা হইয়াছে।

মূল কাহিনী হইতে এই সর্গান্তর্গত কাহিনী বিচ্ছিন্ন মনে হইতে পারে। কিন্তু ইহার প্রয়োজনীয়তা বা সার্থকতা কম নহে। এ সম্বন্ধে কবি নিজেই এক পত্রে বলিয়াছেন—Perhaps the episode of Sita's abduction (Fourth Book) should not have been admitted, since it is scarcely connected with the progress of the Fable. But would you willingly part with it ?

বাস্তবিক, মেঘনাদবধ কাব্যের এই চতুর্থ সর্গের কাহিনীকে মূল আখ্যায়িকা হইতে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। ইহা মূল কাহিনীর সূত্রটিকে ধরিবার সহায়তা করিয়াছে।

পাশ্চাত্ত্যের মহাকাব্য রচনার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া মধুসূদন তাঁহার মেঘনাদবধ কাব্যখানি রচনা করিয়াছিলেন। পাশ্চাত্ত্য আদর্শে মহাকাব্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে শাখা-কাহিনী (episode) রচনার বিশেষ প্রয়োজন আছে। এই প্রয়োজন উপলব্ধি করিয়াই মধুসূদন তাঁহার কাব্যের চতুর্থ সর্গ রচনা করিয়াছেন। মেঘনাদবধ কাব্যের এই সর্গটি পাশ্চাত্ত্য মহাকাব্যান্তর্গত শাখা-কাহিনীর সমশ্রেণীর। এই শাখা-কাহিনীটির সহায়তায় কবি রামায়ণ-কাহিনীর পূর্বাপর বৃত্তান্ত সংক্ষেপে পাঠকের গোচর করিয়াছেন। এই সর্গে লঙ্কা-যুদ্ধের পূর্ববর্তী ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে, আবার লঙ্কাযুদ্ধের পরিণাম বা পরবর্তী ঘটনাও বর্ণনা করা হইয়াছে।

হোমার যেমন ট্রয়যুদ্ধের খণ্ডাংশ বর্ণনা করিয়া তাঁহার মহাকাব্য রচনা

করিয়াছিলেন, মধুসূদনও সেইভাবে লঙ্কাসমরের খণ্ডাংশ লইয়া তাঁহার মেঘনাদ-বধ কাব্য রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তাই কাব্যরচনায় প্রবৃত্ত হইয়াই সীতা ও সরমার কথোপকথনের মধ্য দিয়া রামের বনগমন হইতে আরম্ভ করিয়া সীতার উদ্ধার পর্যন্ত রামায়ণের মূল আখ্যানবস্তুর একটি সংক্ষিপ্ত অথচ পরিপূর্ণ চিত্র তাঁহাকে দিতে হইয়াছে। মূল ঘটনার পশ্চাতে থাকিয়া চতুর্থ সর্গটি মূল ঘটনাকে উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে।

তাছাড়া, সীতার মর্মভেদী বেদনা এবং শোকবাষ্পই যে রাবণের বিনাশের কারণ, তাহা এই সর্গের মধ্য দিয়া পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। কাব্যের বিয়োগান্তক পরিসমাপ্তি ঘটাইবার জন্য সীতা চরিত্রের অবতারণা মধুসূদনকে বাধ্য হইয়াই করিতে হইয়াছে।

এ কাব্যের তৃতীয় সর্গে প্রমীলা চরিত্রে বীরাঙ্গনার যেমন একটি নিখুঁত চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, এই সর্গে তেমনই সীতার চরিত্র মূর্তিমতী কোমলতা পবিত্রতা এবং করুণার প্রতিমূর্তি হইয়া উঠিয়াছে। প্রমীলা সৌন্দর্যে মধ্যাহ্ন-দীপ্তি-প্রখরা, সীতা মাধুর্যে উষাস্নাত স্নিগ্ধ-শীতলা। দুঃখের অগ্নিপরীক্ষায় দগ্ধ করিয়া বাল্মীকি তাঁহার রামায়ণে যে চিত্র আঁকিয়া গিয়াছেন, মধুসূদন তাঁহার মেঘনাদবধ কাব্যে তাহারই আরতি করিয়াছেন।

মধুসূদনের সীতায় মূল রামায়ণের আদর্শ অক্ষুণ্ণ থাকিলেও, এ চরিত্রটি অনেকাংশে নূতন মাধুর্যেও উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। সীতা-চরিত্রাঙ্কনে ভবভূতি কালিদাসের প্রভাবকে স্বীকার করিয়া লওয়ায় কবির তুলিকায় সীতার এক নবরূপান্তর ঘটিয়াছে।

মধুসূদনের সীতা বিশ্বপ্রকৃতির সহিত এক অচ্ছেদ্য বন্ধনে যুক্ত। কালিদাসের 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্' নাটকে যেমন দেখা যায় যে, শকুন্তলা তপোবনের অঙ্গীভূত,—তিনি চতুর্দিকের তপোবন-প্রকৃতির সহিত একাত্মভাবে বিজড়িত, মেঘনাদবধ কাব্যের সীতাকেও তেমনি পঞ্চবটী বনের অঙ্গীভূত করিয়া কল্পনা করা হইয়াছে। পঞ্চবটী বনের চেতন-অচেতন সকলের সহিত,—তরু-লতা, মৃগ-পক্ষী সকলের সহিতই তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। ভবভূতির উত্তররামচরিতে প্রকৃতির সহিত মানুষের আত্মীয়বৎ সৌহার্দ্য যেমন ব্যক্ত হইয়াছে, মধুসূদনে তাহারও আভাস ফুটিয়া উঠিয়াছে। তমসা-নদী উত্তর-চরিতের সীতার প্রিয়সখী, ময়ূর ও করিশিশু তাঁহার কৃতকপুত্র, তরুলতা

পরিজনবর্গ। রাজপ্রাসাদে থাকিয়াও সেখানে সীতার প্রাণ অরণ্যের জন্য কাঁদিয়াছে। মেঘনাদবধ কাব্যের সীতাও অশোকবনে বসিয়া পঞ্চবটী বনের জন্য ক্রন্দন করিয়াছেন। প্রকৃতির সহিত বিচ্ছেদের বেদনা তাঁহাকে কাতর করিয়া তুলিয়াছে।

মধুসূদনের কাব্যে কেবল পঞ্চবটী বনের সহিত সীতার আত্মীয়তার বন্ধনের কথা নাই, এ কাব্যের সীতা অশোক বনের সহিতও প্রীতি-প্রেমের সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছেন। এ কাব্যে সীতার দুঃখবেদনার গভীরতায় সমস্ত অরণ্য-প্রকৃতি নিস্পন্দ হইয়াছে। নিরাভরণা সীতার প্রতি সহানুভূতিতে তরুরাজি তাহাদের ফুলসাজ মোচন করিয়াছে; এবং—

দূরে প্রবাহিণী,
উচ্চ বীচি-রবে কাঁদি, চলেছে সাগরে,
কহিতে বারীশে যেন এ দুঃখ-কাহিনী।

এখানে সীতার দুঃখবেদনার কথা শোনার জন্য নীলাম্বরের শশীর, কুঞ্জবনের পক্ষিকুলের অপরিসীম অধীরতা সৃষ্টি হইয়াছে।

মেঘনাদবধ কাব্যের চতুর্থ সর্গে আমরা পঞ্চবটী বনের ও অশোক বনের সীতার যে চিত্র পাই, উহারই মধ্য দিয়া কবি সীতার সমগ্র প্রকৃতিকে আমাদের গোচর করিয়াছেন। পঞ্চবটী বনের সীতা 'ভবতলে মূর্তিমতী দয়া, পরদুঃখে কাতর সতত'। মাধুর্যে, সেবায়, পতিপ্রেমে, জীবপ্রেমে তিনি অপরূপ। কুটীর-দ্বারে যখন 'শিখী-সহ শিখিনী সুখিনী' আসিয়া নৃত্য করিয়া সীতার আনন্দবিধান করিয়াছে, যখন—

অতিথি আসিত নিত্য করভ, করভী,
মৃগশিশু, বিহঙ্গম, স্বর্ণ অঙ্গ কেহ,
কেহ শুভ্র, কেহ কাল, কেহ বা চিত্রিত,
যথা বাসবের ধনুঃ ঘন-বর শিরে;
অহিংসক জীব যত।—

তখন সীতা তাহাদিগকে মহাদরে সেবা করিয়াছেন। এই চিত্রে সীতার দাম্পত্যপ্রেমের এক রূপান্তর আমরা লক্ষ্য করিয়াছি। সীতাচরিত্রে প্রেমের পরিণতি করুণায় বা প্রীতিতে। যে প্রেম মঙ্গলকিরণে উদ্ভাসিত, যে প্রেম প্রিয়কে কেন্দ্র করিয়া আপন মঙ্গলমাধুর্য বিশ্বপরিধির মধ্যে বিকীর্ণ করিয়া দিতে

চাহে, সীতায় আমরা সেই প্রেম দেখিয়াছি। যে প্রেম সেবা ও করুণার মধ্য দিয়া, ত্যাগ ও বেদনার মধ্য দিয়া, সংযমের মধ্য দিয়া সার্থকতা লাভ করে, সীতার মধ্যে কবি সেই প্রেমের বিকাশ দেখিয়া উহার আরতি করিয়াছেন। সীতা একাধারে প্রিয়া ও জননী। প্রিয়া ও মাতার মিলনে নারীত্বের যে সম্পূর্ণতা, সেই পরিপূর্ণ চিরন্তনী নারীকে মধুসূদন সীতার মধ্যে দেখিয়াছেন। এখানে তাই সীতা চরিত্র তাহার বিশেষ রূপটি হারাইয়া নির্বিশেষ একটি সত্তায় পরিণত হইয়া গিয়াছে। ইহাতেই এ চরিত্র আর বাল্মীকির সীতা নাই, ইনি পূর্ণতারূপিণী নারীর প্রতীকচিত্র হইয়া পড়িয়াছেন। এ সীতা যেন রবীন্দ্রনাথের 'ক্ষণিকা'র কল্যাণী। যে-শ্রেণীর নারীকে উদ্দেশ্য করিয়া রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন—

প্রভাত আসে তোমার দ্বারে,
পূজার সাজি ভরি';
সন্ধ্যা আসে সন্ধ্যারতির
বরণডালা ধরি'।
সদা তোমার ঘরের মাঝে
নীরব একটি শঙ্খ বাজে,
কাঁকন দুটির মঙ্গল-গীত
উঠে মধুর স্বরে।

ভালে তোমার আছে লেখা
পুণ্যধামের রশ্মিরেখা,
সুধাস্নিগ্ধ হাসিখানি
হাসে চোখের 'পরে।

মেঘনাদবধ কাব্যের সীতাকে কবি ঐ শ্রেণীর নারী করিয়া তুলিয়াছেন। এ নারীর শ্রী ও সৌন্দর্য চির-অমলিন। ইহাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলা যায়—

তোমার নাহি শীতবসন্ত,
জরা কি যৌবন।
সর্বঋতু সর্বকালে
তোমার সিংহাসন।

নিভেনাক প্রদীপ তব,
পুষ্প তোমার নিত্য নব,
অচলা শ্রী তোমায় ঘেরি
চির বিরাজ করে।

এবং রবীন্দ্রনাথ যেমন তাঁহার শেষ গানের শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্যে এই কল্যাণী নারীর আরতি করিয়াছেন, মধুসূদনও তেমনই তাঁহার অন্তরের অকুণ্ঠ ভক্তি নিবেদন করিয়াছেন সীতারূপিণী এই ভাবপ্রতিমার প্রতি।

সীতা এবং প্রমীলা উভয়েই প্রেমে মহীয়সী। কিন্তু কবি ঐ দুইটি চরিত্রের মধ্য দিয়া প্রেমের রূপভেদ দেখাইয়াছেন। প্রমীলার প্রেমে আছে চাঞ্চল্য। উহা পর্বতগুহানিঃসৃত নির্ঝরিণীর মত কলনৃত্যে গলিয়া বহিয়া ছুটিতে চাহিয়াছে। মেঘনাদের সহিত মিলিত হইবার জন্য তাঁহার অন্তবিহীন আকুতি। সমুদ্রে গিয়া মিলিতে হইবে—এই দুর্নিবার প্রেরণায় ঝরণা যেমন পর্বতগাত্রের সকল বাধা অতিক্রম করিয়া চলিতে কুণ্ঠিত হয় না, প্রমীলার প্রকৃতিও তদ্রূপ।

প্রমীলার প্রেমে রহিয়াছে আবেগ, কিন্তু সীতায় রহিয়াছে স্তব্ধতা। যে প্রেম অন্তরে আশার প্রদীপটি জ্বালিয়া রাখিয়া ভাবী মিলনের অধীর প্রতীক্ষায় দিনযাপন করে, সীতায় সেই প্রেমের বিকাশ দেখা গিয়াছে। রাক্ষস-রাজ রাবণ তাঁহাকে হরণ করিয়া আনিয়াছেন—রামের সহিত তাঁহার বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে। কিন্তু নীরবে তিনি বিরহবেদনা সহ্য করিয়াছেন। তিনি সর্বংসহা ধরিত্রীর কন্যা, তাই কবি তাঁহাকে সহিষ্ণুতার প্রতিমূর্তি করিয়া আঁকিয়াছেন।

অশোকবনের সীতা কেবল ম্লানমুখী বিরহকাতরা রাঘবেন্দ্রপ্রিয়া নহেন। তিনি তেজস্বিনীও। লক্ষ্মণ তাঁহাকে একাকিনী রাখিয়া কুটীরত্যাগে অসম্মত হইলে তিনি বলিয়াছেন—

যাব আমি
দেখিব করুণ স্বরে কে স্মরে আমারে
দূর বনে।

ইহার মধ্য দিয়া একদিকে রামের অমঙ্গল আশঙ্কায় পতিগতপ্রাণা সীতার বিচলিত ভাব ফুটিয়াছে, অন্যদিকে তাঁহার তেজোব্যঞ্জক এক মূর্তি আমরা

প্রত্যক্ষ করিয়াছি। এক হিসাবে মধুসূদনের এই সীতার চিত্রটি বাল্মীকির সীতা অপেক্ষাও নিখুঁত হইয়াছে। আর্ষ রামায়ণে লক্ষ্মণের প্রতি ভর্ৎসনায় সীতাচরিত্রের যে ত্রুটিটুকু আমাদের চোখে পড়ে, মেঘনাদবধ কাব্যে মধুসূদন তাহা সংশোধন করিয়া এই চরিত্রটিকে এক অনবদ্য মাধুর্যে ভূষিত করিয়া তুলিয়াছেন। যে ব্রহ্মচারী শুধু ভ্রাতৃপ্রেমে রাজ্যসুখ পিছনে ফেলিয়া আসিয়াছিলেন, বনবাসী হইয়াছিলেন; যিনি সীতার পায়ের নূপুর ছাড়া অন্য কোন অলঙ্কারই চিনিতেন না, সেই লক্ষ্মণের প্রতি আর্ষ রামায়ণের সীতা যে ভর্ৎসনাবাক্য উচ্চারণ করিয়াছিলেন, তাহা সমর্থন করা যায় না। কিন্তু লক্ষ্মণের প্রতি মেঘনাদবধ কাব্যের সীতার ভর্ৎসনা অন্যরূপ।

অশোকবনের সীতাকে কবি রাক্ষসপরিবারের প্রতি করুণা ও সহানুভূতি-বিমণ্ডিত করিয়া তুলিয়াছেন। সহানুভূতিপূর্ণ এবং করুণার প্রতিমূর্তি সীতার যে চিত্রের সূত্রপাত এই সর্গে হইয়াছে, তাহা পূর্ণপরিণত হইয়া উঠিয়াছে এ কাব্যের নবম সর্গে। সেখানে মেঘনাদের মৃত্যু এবং প্রমীলার সহমরণ সংবাদ সীতা যখন প্রাপ্ত হইয়াছেন, তখন কেবল যে আপন মুক্তির উল্লাস তাঁহার অন্তরে জাগিয়াছে তাহা নহে, রাক্ষসবংশের দুরবস্থার কথা স্মরণ করিয়া তাঁহার হৃদয় বিগলিত হইয়াছে। রাক্ষসবংশের প্রতি এরূপ অনুকম্পা রামায়ণের সীতাচরিত্রে লক্ষিত হয় না। ইহা মধুসূদনের মৌলিক কল্পনা। বীরাঙ্গনা প্রমীলাচরিত্র সৃষ্টিতে মধুসূদন যেমন মৌলিকতার পরিচয় দিয়াছেন, সীতা চরিত্রাঙ্কনেও তেমনি মধুসূদনের মৌলিকতার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। রাক্ষসপরিবারের দুরবস্থায় সীতা যেভাবে অশ্রুপাত করিয়াছেন, তাহাতে এই অশ্রুমতী দেবী অশ্রুবিন্দুর মতই শুভ্র সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছেন।

মেঘনাদবধ কাব্যের পঞ্চম সর্গের দৃশ্য স্বর্গে ও মর্ত্যে। এই সর্গের নাম 'উদ্যোগ'। মেঘনাদের বধের উদ্যোগ এই সর্গে বর্ণিত হইয়াছে। লক্ষ্মণ বহু বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া দেবী মহামায়ার পূজা করিয়া দুর্মদ মেঘনাদকে বধ করিবার বর লাভ করিলেন, দৈবাস্ত্র লাভ করিলেন,—উহাই এই সর্গের বর্ণনীয় বিষয়।

সিদ্ধির পথ বন্ধুর ও বিঘ্নসঙ্কুল—মধুসূদন তাই লক্ষ্মণকে বহু বিভীষিকা, প্রলোভনের বাধা অতিক্রম করাইয়া তাঁহাকে দিয়া ইষ্টদেবতার বর এবং দৈবাস্ত্রসকল লাভ করাইয়াছেন। এখানে লক্ষ্মণের প্রতি কবির পরিপূর্ণ

সহানুভূতি। লক্ষ্মণ এখানে মেঘনাদের উপযুক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী রূপে অঙ্কিত হইয়াছেন। শুচিতায় ও শক্তিমত্তায় লক্ষ্মণ এখানে অতুলনীয়।

দৈবাস্ত্র-লাভের পূর্বে, মায়াদেবীর মন্দিরে পৌঁছিবার প্রাক্কালে, লক্ষ্মণের সম্মুখে ভীমদর্শন শূলপাণি, মায়াসিংহ, অন্ধকার, মেঘগর্জন, ঝঞ্ঝাবায়ু, বিদ্যুৎ, বজ্রপাত, দাবানল, ভূকম্পন, সমুদ্রগর্জন প্রভৃতি নানাবিধ বিভীষিকার আবির্ভাব হইয়াছে। কিন্তু লক্ষ্মণ শত প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও ভীত বা সঙ্কল্প হইতে বিচ্যুত হন নাই। অবশেষে তিনি কঠিনতম পরীক্ষার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছেন—সে পরীক্ষায় দেবতা ও ঋষিদিগেরও চিত্ত বিক্ষিপ্ত হইয়া যায়। অপরূপ লাবণ্যময়ী অপ্সরাগণ আবির্ভূতা হইয়া প্রণয়সম্ভাষণ করিয়া, নানা উপায়ে লক্ষ্মণের মন হরণ করিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু কোন দৈবী ছলনা জিতেন্দ্রিয় বীর লক্ষ্মণকে সঙ্কল্পচ্যুত করিতে পারিল না। নির্ভীকচিত্তে বীর সৌমিত্রি মায়াদেবীর সকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া চণ্ডীর মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার পূজায় সিংহবাহিনী সুপ্রসন্ন হইয়া বরদান করিলেন।

অন্যদিকে পূর্বাকাশে ঊষার অরুণ আভা জাগিয়া উঠিল। বিহগকাকলি শুনিয়া মেঘনাদ নিদ্রাভঙ্গে জাগিয়া উঠিলেন, পত্নীর কর্ণে মৃদুমধুর প্রেমগুঞ্জন করিয়া তাহাকে জাগাইলেন। তারপর যুদ্ধযাত্রার পূর্বে মাতার নিকট হইতে আশীর্বাদ লইবার জন্য প্রমীলাকে সঙ্গে করিয়া মেঘনাদ লঙ্কেশ্বরীর নিকটে গমন করিলেন। প্রথমে মাতার নিকট, পরে প্রমীলার নিকট হইতে বিদায় লইয়া মেঘনাদ নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারের দিকে যাত্রা করিয়াছেন। মেঘনাদ বীর, কিন্তু মায়ের আশীর্বাদ ও দেবতার অনুগ্রহের দ্বারা তিনি নিজেকে সুরক্ষিত করিয়াছেন।

এই সর্গে মন্দোদরীর সহিত আমাদের প্রথম সাক্ষাৎকার ঘটিয়াছে। তিনি রাবণের প্রধানা মহিষী, মেঘনাদের জননী। তাঁহাকে আমরা প্রথম দেখি শিবের মন্দিরে। সেখানে পুত্রের—

মঙ্গল-হেতু তিনি
অনিদ্রায় অনাহারে পূজেন উমেশে।

মন্দোদরীর মূর্তি মাতৃত্বের মূর্তি। বাংলার মাতৃহৃদয়ের স্নেহব্যাকুলতা, আশা-আশঙ্কা মন্দোদরীর মধ্যে বর্তমান। ইহা আমাদের প্রত্যক্ষদৃষ্ট চরিত্র। বাংলার মাতৃহৃদয়ের ভাবকে কবি রক্ষোরাজ-মহিষীর উপর আরোপ করিয়া চরিত্রটির সহিত বাঙ্গালীর অন্তরের যোগ ঘটাইয়া দিয়াছেন।

যে নারী স্বামি-পুত্রের মঙ্গলকামনা করিয়া ব্রত-উপবাসে দিনযাপন করেন, মন্দোদরী সেই শ্রেণীর নারী। ইনি পুত্রের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিণী, আবার স্বামীর বংশগৌরব সম্বন্ধেও সচেতন। তাই পুত্রকে যুদ্ধার্থে বিদায় দিতে তাঁহার বুক ফাটিয়া যায়, তবু স্বামিপুত্রের বংশগৌরব রক্ষার জন্য তিনি পুত্রকে বিদায় দেন। পুত্রবধূর মুখ চাহিয়া, 'রাক্ষসকুল-রক্ষণ' বিরূপাক্ষের উপর নির্ভর করিয়া তিনি সান্ত্বনা খুঁজিয়া পাইয়াছেন।

কাব্যের তৃতীয় সর্গে প্রমীলার যে চিত্র আমরা দেখিয়া আসিয়াছি, উহা এই সর্গেও অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। প্রমীলা এখানে একদিকে স্বামীকে বীরসাজে সাজাইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরণ করিবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিয়াছেন, অন্যদিকে কুলবধূর মত স্বামীর মঙ্গলাকাঙ্ক্ষায় উদ্বুদ্ধ হইয়া দেবতার নিকট প্রার্থনা করিয়াছেন। একদিকে তাঁহার মনের কোণে স্বামীর অমঙ্গল আশঙ্কা উঁকি দিয়াছে, অন্যদিকে স্বামীকে বীরত্বের গরিমায় প্রতিষ্ঠিত করিবার সাধ তাঁহার মনে জাগিয়াছে। শেষ পর্যন্ত তিনি প্রেয়কে ছাড়িয়া শ্রেয়কে আশ্রয় করিয়াছেন। স্বামীর মহৎ কর্তব্যপালনের পথে তিনি অন্তরায় হইয়া দাঁড়ান নাই।

চণ্ডীর মন্দিরাভিমুখে যাত্রার পূর্বে লক্ষ্মণ এই সর্গে রামের অনুমতি লইয়াছেন,—সেই সূত্রে রাম চরিত্রের স্নেহপ্রবণতা, কোমল বৃত্তির সহিত আমাদের পরিচয় ঘটিয়াছে।

বাল্মীকির রামে যে বীরত্বগরিমা আছে, মধুসূদনের রামে সে বীরত্বগরিমা নাই সত্য। কিন্তু এ কাব্যের রামের মহিমা বীরত্বে না হইলেও, ভ্রাতৃস্নেহে—কোমল প্রবৃত্তিতে এ চরিত্রের গৌরব। স্নেহপ্রবণতায় এ চরিত্র উজ্জ্বল। লক্ষ্মণ তাঁহার প্রধান ভরসা, শক্তি ও সহায়স্বরূপ। তাই বিপদ-বিঘ্নের মুখে তাঁহাকে প্রেরণ করিতে রামের চিত্ত সংশয়ে, আশঙ্কায় আন্দোলিত হইয়া উঠে। শক্তি-শেলাহত লক্ষ্মণের জন্য বিলাপ করিয়া তিনি বলেন—

> কিন্তু ক্লান্ত যদি তুমি এ দুরন্ত রণে
> ধনুর্ধর, চল ফিরি যাই বনবাসে ;
> নাহি কাজ, প্রিয়তম, সীতায় উদ্ধারি',—
> অভাগিনী ! নাহি কাজ বিনাশি রাক্ষসে।

মধুসূদন রামের সম্পর্কে—I despise Rama and his rabble বলিলেও,

রামের কোমলতার মধ্যে যে মাধুর্যটুকু আছে, তাহা দেখিয়াছেন। রামকে তিনি 'নৃমণি' (তৃতীয় সর্গ), 'রাঘবেন্দ্র বলী' (৪র্থ সর্গ), 'রাঘবচন্দ্র দেবকুলপ্রিয়' (পঞ্চম সর্গ), প্রভৃতি বিশেষণেও ভূষিত করিয়াছেন। এই রাম প্রমীলার বীরধর্মের মর্যাদা রক্ষা করিয়াছেন, প্রমীলার পতিভক্তিরূপ গুণের নিকট নতি স্বীকার করিয়া আপন শ্রেষ্ঠত্ব এবং মহিমারই পরিচয় দিয়াছেন। তৃতীয় সর্গে প্রমীলার দূতীর নিকট বলিয়াছেন—

বীরপত্নী, হে সুনেত্রা দূতি,
তব ভর্ত্রী, বীরাঙ্গনা সখী তাঁর যত।
কহ তাঁরে শত মুখে বাখানি ললনে,
তাঁর পতি-ভক্তি আমি, শক্তি, বীরপণা—
বিনা রণে পরিহার মাগি তাঁর কাছে!
ধন্য ইন্দ্রজিৎ! ধন্য প্রমীলা সুন্দরী!

পত্নী প্রমীলার নিকট হইতে বিদায়-গ্রহণকালে মেঘনাদের নির্ভীকতার পরিচয় এই সর্গে পাওয়া গিয়াছে। মেঘনাদবধ কাব্যের সর্বত্রই ইন্দ্রজিতের এই নির্ভীকতা অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। লঙ্কার বীরগণকে একে একে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে দেখিয়াও তিনি ভীত বা চঞ্চল হন নাই। জননীর নিকট বিদায় লইবার সময়ে তিনি বলিয়াছেন—

শিশু ভাই বীরবাহু, বধিয়াছে তারে
পামর, দেখিব মোরে নিবারে কি বলে?

পুত্রের অমঙ্গল আশঙ্কায় মন্দোদরী বিহ্বলা হইয়া পড়িলে তিনি বলিয়াছেন—

কি ছার সে রাম তারে ডরাও আপনি?

পাইয়াছি পিতৃ-আজ্ঞা, দেহ আজ্ঞা তুমি।
কে আঁটিবে দাসে দেবি, তুমি আশীষিলে?

পত্নীর নিকট মেঘনাদের সান্ত্বনাবাক্য আরও নির্ভীকতার পরিচায়ক।—

এখনি আসিব,
বিনাশি রাঘবে রণে, লঙ্কা-সুশোভিনি!

এ কাব্যের পঞ্চম সর্গ রচনায় কবির উপর মিলটনের প্রভাব পড়িয়াছে। মিলটনের প্যারাডাইস লষ্টে ক্রাইষ্টকে সয়তানের প্রলোভন দেখানোর

বৃত্তান্ত আছে। লক্ষ্মণের চিত্রাঙ্কনে উহা কবিকে প্রভাবিত করিয়াছে। ইন্দ্রজিৎ-কর্তৃক প্রমীলার নিদ্রাভঙ্গের বর্ণনাও প্যারাডাইস লষ্টের অ্যাডাম-কর্তৃক ঈভের নিদ্রাভঙ্গের অনুরূপ।

মেঘনাদবধ কাব্যের মূল ঘটনা—মেঘনাদের বধ, এই কাব্যের ষষ্ঠ সর্গে বর্ণিত হইয়াছে। মায়াদেবী ও বিভীষণের সহায়তায় লক্ষ্মণ এই সর্গে মেঘনাদকে বধ করিয়াছেন অন্যায়যুদ্ধে অধর্ম করিয়া। মেঘনাদের চরিত্রটি মধুসূদনের কবিকল্পনাকে সব চেয়ে বেশী আকৃষ্ট করিয়াছিল। তাই তিনি মেঘনাদের নামেই তাঁহার কাব্যের নামকরণ করিয়াছেন এবং মেঘনাদের পৌরুষবীর্যের গৌরবগাথাকে, তাঁহার জীবনের নিষ্ফল পরিণামকে, মেঘনাদের হত্যাজনিত পরাজয়ের কাহিনীকেই তাঁহার কাব্যের মধ্যে প্রাধান্য দিয়া গিয়াছেন।

ষষ্ঠ সর্গে মেঘনাদকে প্রথমে আমরা ধ্যাননিরত দেখিতে পাই। যুদ্ধ-যাত্রার পূর্বে তিনি নিকুম্ভিলা যজ্ঞ সমাধা করিতেছিলেন। সেই যজ্ঞাগারে মায়াদেবীর সহায়তায় লক্ষ্মণ বিভীষণের সহিত প্রবেশ করিয়া মেঘনাদকে বধ করিতে উদ্যত। ধ্যানভঙ্গ হইলে মেঘনাদ লক্ষ্মণকে ইষ্টদেব ভাবিয়াছিলেন কিন্তু যখন তাঁহার সে ভ্রম দূর হইয়াছে, তখন তিনি বিস্মিত হইয়াছেন, কিন্তু ভীত হন নাই। ক্ষত্রিয় বীরের মতই তিনি বলিয়াছেন—

> সত্য যদি রামানুজ তুমি, ভীমবাহু
> লক্ষ্মণ, সংগ্রাম-সাধ অবশ্য মিটাব
> মহাহবে আমি তব ; বিরত কি কভু
> রণরঙ্গে ইন্দ্রজিৎ ?

পরমুহূর্তে তিনি বলিয়াছেন—

> আতিথেয় সেবা
> তিষ্ঠি, লহ, শূরশ্রেষ্ঠ প্রথমে এ ধামে—
> রক্ষোরিপু তুমি, তবু অতিথি হে এবে।

মেঘনাদ এখানে কেবল নির্ভীক যোদ্ধারূপে আত্মপ্রকাশ করেন নাই, তিনি এখানে উদার, শত্রুর প্রতিও শিষ্টাচারপরায়ণ। যুদ্ধের আগ্রহের সহিত অতিথির সেবার জন্যও তাঁহার আগ্রহ। লক্ষ্মণ তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী বীর,

একথা তিনি যেমন ভুলেন নাই,—তেমনি লক্ষ্মণ যে তাঁহার অতিথি একথাও মেঘনাদ বিস্মৃত হন নাই।

মেঘনাদের চরিত্র এই সর্গে চরমোৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। এখানে মেঘনাদের ন্যায়-অন্যায়ের বোধ চমৎকার ফুটিয়াছে। পূজার মন্দিরে নিরস্ত্রকে যুদ্ধে আহ্বান করা, অথবা তাহাকে বধ করিতে উদ্যত হওয়া যে কাপুরুষতার লক্ষণ এ বোধ মেঘনাদের আছে, কিন্তু লক্ষ্মণের সে বোধ নাই। তিনি নিরস্ত্র মেঘনাদকেই বধ করিতে উদ্যত। কবি এখানে মেঘনাদ ও লক্ষ্মণের —উভয়ের আচরণের তুলনা দ্বারা মেঘনাদের চরিত্রকে উজ্জ্বলতর, মহান্ এবং উদার করিয়া তুলিয়াছেন।

মেঘনাদ এই সর্গে বিপদে স্থির, নির্ভীক। তাঁহার দেশাত্মবোধ অতুলনীয়, স্বজাত্যভিমান তাঁহার অন্তরে পূর্ণমাত্রায় বর্তমান। খুল্লতাত বিভীষণকে অস্ত্রাগারের দ্বারে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া তিনি বিনীত বচনে তাঁহাকে অস্ত্রাগারের দ্বার ছাড়িয়া দিতে বলিয়াছেন। তাঁহাকে মৃদু ভর্ৎসনা করিয়াছেন—তাঁহার অন্তরে দেশাত্মবোধ ও স্বজাত্যভিমান জাগাইয়া দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু দুর্বিনীত ব্যবহার করেন নাই। পরিশেষে যখন তাঁহার সমস্ত অনুনয় ব্যর্থ হইয়াছে, নিজের মৃত্যু যখন তিনি অবশ্যম্ভাবী বলিয়া বুঝিয়াছেন,—তখনও তিনি ভয়ব্যাকুলিত চিত্তে মুষড়াইয়া পড়েন নাই। তখনও তিনি উন্নত মস্তকে, নির্ভীক চিত্তে বিভীষণকে ধর্মোপদেশ দিয়া বলিয়াছেন যে, রাঘবপক্ষে যোগ দেওয়া তাঁহার উচিত হয় নাই। কারণ—

শাস্ত্রে বলে, গুণবান্ যদি
পরজন, গুণহীন স্বজন, তথাপি
নির্গুণ স্বজন শ্রেয়ঃ, পর পর সদা।

মেঘনাদ ধার্মিক, যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান তিনি করিয়াছেন। তিনি শাস্ত্রজ্ঞ—শাস্ত্রের বচন উদ্ধার করিয়া তিনি তাঁহার খুল্লতাতের কর্তব্যবোধ, দেশপ্রীতি জাগাইতে চেষ্টা করিয়াছেন।

অন্যায়-সমরে এইরূপ বিবিধ গুণে গুণান্বিত মেঘনাদের পতন ও বিজয়ী লক্ষ্মণের রামের নিকট প্রত্যাবর্তনের পর এই সর্গ শেষ হইয়াছে।

নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে যজ্ঞরত নিরস্ত্র মেঘনাদকে লক্ষ্মণ দৈব-আনুকূল্য গ্রহণ করিয়া যেভাবে বধ করিয়াছেন, তাহা ক্ষাত্রধর্মানুমোদিত হয় নাই,

এবং এজন্য মেঘনাদবধ কাব্যের এই সর্গটি নিকৃষ্ট একটি সর্গে পরিণত হইয়াছে—এরূপ মত কোন কোন সমালোচক প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু একটু অভিনিবেশ সহকারে মেঘনাদবধ কাব্যখানি পাঠ করিয়া বিচারে প্রবৃত্ত হইলে, এ কাব্যের ষষ্ঠ সর্গটিকে নিকৃষ্ট একটি সর্গ বলিয়া মনে হয় না। বরং মনে হয় যে, সর্গটি সমগ্র মেঘনাদবধ কাব্যের মধ্যে একটি উৎকৃষ্ট সর্গ। প্রথম সর্গ হইতে মেঘনাদের যে নির্ভীকতার চিত্র কবি আঁকিতে শুরু করিয়াছিলেন, তাহা এখানে আসিয়া রূপে ও রঙে পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে,—বীরত্ব ও নির্ভীকতার সহিত অন্যান্য বহু গুণের মিলনে চরিত্রটি এই সর্গেই অনিন্দ্যসুন্দর কান্তি পরিগ্রহ করিয়াছে। এখানে চরিত্রটি প্রেম, ভক্তি, বিশ্বাস ও আত্মপ্রত্যয়ের একটি উজ্জ্বল চিত্র হইয়া উঠিয়াছে। মেঘনাদ ক্রূরতায় বা কপটতায় বিশ্বাস করেন না, জগৎকে তিনি আপনার মতই বীরধর্মী মনে করিয়াছেন। এই মেঘনাদের মৃত্যুদৃশ্য এ কাব্যের ষষ্ঠ সর্গে।

সর্বাঙ্গসুন্দর নির্দোষ-চরিত্র ব্যক্তির জীবন নিষ্ঠুর নিয়তির তাড়নায় কিভাবে বিনষ্ট হইয়া যায়,—কি করিয়া বিধির দ্বারা অমিত শক্তিধর পুরুষও নির্জিত হয়, মেঘনাদবধ কাব্যের ষষ্ঠ সর্গে তাহাই দেখানো হইয়াছে। ইন্দ্রজিৎ নিজে নিষ্পাপ। তিনি অপরাজেয় বীর। তথাপি অসহায়ের মত তাঁহাকে মৃত্যুবরণ করিতে হইল। যে চরিত্র শ্রেষ্ঠ ও সুন্দর, যে চরিত্র সর্বগুণের আধার, তাহাকেও যে বিধি-বিড়ম্বিত হইতে হয়, কবি এই সর্গে তাহা দেখাইয়াছেন।

রাবণের জীবনের ট্র্যাজেডী যে এ কাব্যের ট্র্যাজেডী, তাহা দেখানোই ছিল মধুসূদনের উদ্দেশ্য। রাবণের পাপেই বীরবাহুর পতন হইয়াছে। তাঁহার পাপে জ্ঞাতি-বন্ধু-পুত্র-পুত্রবধূর জীবনদীপ একটি একটি করিয়া নিভিয়াছে। ইন্দ্রজিতের মৃত্যুও রাবণের পাপের ফল,—ইহা ইন্দ্রজিতের কর্মফল নহে। ষষ্ঠ সর্গে ইহা অতিশয় সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।

মেঘনাদবধ কাব্যের ষষ্ঠ সর্গে ইন্দ্রজিতের সমুন্নত চরিত্রমহিমা, নিষ্করুণ নিয়তির সহিত তাঁহার একক সংগ্রাম, এই সর্গটিকে মহাকাব্যের উদাত্ত মহিমায় মণ্ডিত করিয়াছে।

ষষ্ঠ সর্গে আরও দেখানো হইয়াছে যে, মেঘনাদের মত বীরকে নিহত করিতে হইলে দৈব-আনুকূল্য গ্রহণ ব্যতীত অন্য কোন পথ নাই। যে লক্ষ্মণকে

কবি মেঘনাদের সমকক্ষ বীররূপে পঞ্চম সর্গে আঁকিয়া তুলিয়াছিলেন, ষষ্ঠ সর্গে তাঁহাকেও মায়াদেবীর দ্বারা সুরক্ষিত হইয়া লঙ্কার পুরপ্রাচীরের মধ্যে প্রবেশ করিতে হইয়াছে এবং নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারের ভিতরে নিরস্ত্র মেঘনাদের সম্মুখীন হইয়া তাঁহাকে বধ করিতে হইয়াছে। এইরূপ দৈব-আনুকূল্যে মেঘনাদের বধ সাধিত হওয়ায় মেঘনাদের বীরত্বগৌরব ক্ষুণ্ণ হয় নাই, বরং ঐরূপ অসহায়তার মধ্যে মৃত্যুবরণে মেঘনাদের জীবন ট্র্যাজিক মহিমায় মহিমান্বিত হইয়া উঠিয়াছে।

মেঘনাদবধ কাব্যের সপ্তম সর্গের নাম 'শক্তিনির্ভেদ'। রামায়ণের শক্তিশেল-বৃত্তান্ত অবলম্বন করিয়া এই সর্গটি রচিত হইয়াছে। কোন কোন সমালোচকের মতে সমগ্র মেঘনাদবধ কাব্যের মধ্যে এই সপ্তম সর্গটি সর্বোৎকৃষ্ট। সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক-উপন্যাস-রচয়িতা রমেশচন্দ্র দত্ত তাঁহার Literature of Bengal নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে,—The Seventh Book is in many respects the sublimest in the work, and perhaps the sublimest in the entire range of Bengali Literature.

বীররসের উদ্দীপনে, যুদ্ধের বর্ণনায়, রাবণ-চরিত্রের শক্তিমত্তা ও দৃঢ়তা বর্ণনায় কবি এই সর্গে ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন। মেঘনাদবধ কাব্যের এই একটি মাত্র সর্গে যুদ্ধের প্রত্যক্ষ বর্ণনা আমরা পাইয়াছি। অন্যান্য সকল সর্গে যুদ্ধ পরোক্ষে হইয়াছে—সর্গমধ্যে আমরা যুদ্ধের জন্য সজ্জা, অথবা যুদ্ধের ফলাফল প্রত্যক্ষ করিয়াছি। মধুসূদন জানিতেন যে, ক্রমাগত যুদ্ধ বর্ণনায় সার্থক কাব্যের জন্মলাভ হয় না। এ বিষয়ে কবির আদর্শ ছিলেন মিলটন, হোমার নহেন। তাই তিনি একবার বলিয়াছিলেন—

Homer is nothing but battles, I have like Milton only one.

এ কাব্যের দ্বিতীয় সর্গে যেমন রাক্ষস ও রাঘবপক্ষে দেবদেবীর সহায়তার কথা বর্ণিত হইয়াছে, এই সপ্তম সর্গেও সেইরূপ হইয়াছে। কবির এই বর্ণনা পাঠ করিয়া হোমারের কাব্যমধ্যস্থ গ্রীক ও ট্রোজানদিগের যুদ্ধে দেবগণের দ্বারা দুই বিভিন্ন পক্ষাবলম্বনের বর্ণনার কথা স্মরণ হয়। মেঘনাদবধ কাব্যের এই সপ্তম সর্গে মহাদেব তাঁহার অনুচর বীরভদ্রের দ্বারা রাবণকে ইন্দ্রজিতের নিধনবার্তা জানাইয়াছেন,—রাবণকে রুদ্রতেজে পূর্ণ

করিয়াছেন। দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয় এই সর্গে রাঘবপক্ষে যুদ্ধার্থে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

রাবণের চরিত্র এই সর্গে চমৎকার ফুটিয়াছে। মেঘনাদের মৃত্যুসংবাদ শ্রবণ করিয়া রাবণ ভাঙিয়া পড়েন নাই। আশা এবং উৎসাহে রাবণ এই সর্গে উৎসাহিত। প্রথম সর্গে রাবণ পুত্রশোকে কাতর হইয়া বীরধর্ম বিস্মৃত হইয়াছেন। কিন্তু সপ্তম সর্গে বীরাগ্রগণ্য মেঘনাদের মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া তিনি বীরত্বে উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছেন। বীরত্বের মহিমায় তিনি এই সর্গে মহিমান্বিত।

এই সর্গে লক্ষ্মণের অতুলনীয় বিক্রম তাঁহার চরিত্রকে মহনীয় করিয়া তুলিয়াছে। লক্ষ্মণ এখানে পঞ্চম সর্গের মতই নির্ভীক, উদ্বেগশূন্য, আত্মবাহুবলে বিশ্বাসপরায়ণ।

লক্ষ্মণের শক্তিশেলে ভ্রাতৃশোকে উচ্ছ্বসিত বেদনায় রামের রোদনের মধ্য দিয়া মেঘনাদবধ কাব্যের অষ্টম সর্গ আরম্ভ হইয়াছে। শোকাহত রামের সমীপে ভক্তবৎসলা পার্বতীর নির্দেশে মায়াদেবী উপস্থিত হইয়াছেন এবং তিনি রামচন্দ্রকে তাঁহার সঙ্গে প্রেতপুরীতে লইয়া গিয়াছেন। প্রেতপুরীতে রাম নানা পাপে পাপীর বহুরূপ নির্যাতন-দৃশ্য দর্শন করিয়াছেন। পরিশেষে বৈতরণীতটে অক্ষয় বটমূলে পিতা দশরথের নিকটে উপস্থিত হইয়াছেন। দশরথের সহিত সাক্ষাৎকারের মধ্য দিয়া রাম লক্ষ্মণের পুনর্জীবন-লাভের উপায় জানিয়াছেন।

রাত্রি প্রভাতের পূর্বেই লক্ষ্মণ পুনর্জীবন লাভ করিয়াছেন। সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে রাঘবপক্ষীয় শিবিরে সৈন্যগণের সমবেত আনন্দধ্বনি উত্থিত হইয়াছে। অন্যদিকে পুত্রশোকাতুর রাবণ পুত্রের প্রেতকৃত্য সমাপনের জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন এবং সপ্তাহকাল অস্ত্রধারণ না করিবার প্রস্তাব জানাইয়া রামের নিকট দূত প্রেরণ করিয়াছেন। রাম সেই প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছেন।

অতঃপর লঙ্কাবাসিগণ সিন্ধুতীরবর্তী শ্মশানাভিমুখে শোকযাত্রায় বাহির হইয়াছে। 'লঙ্কার পঙ্কজ রবি' অস্তাচলে গিয়াছে, সেইজন্য শোকের ছায়া লঙ্কায় অভ্রান্ত গভীর ও ব্যাপক হইয়া নামিয়া আসিল। প্রমীলা স্বামীর সহিত অনুমৃতা হইলেন। রাক্ষসরাজ রাবণ পুত্র ও পুত্রবধূর শোকে মর্মভেদী বিলাপ করিতে লাগিলেন। অবশেষে দুগ্ধধারা-বর্ষণে চিতাগ্নি নির্বাপিত করিয়া

এবং মেঘনাদ-প্রমীলার চিতাভস্ম জলে নিক্ষেপ করিয়া লঙ্কাবাসী রাক্ষসদল অশ্রুসিক্ত নেত্রে শোকাচ্ছন্ন লঙ্কাপুরীতে ফিরিল। সাত দিন ও সাত রাত্রি ধরিয়া সেখানে বিষাদের করুণ ক্রন্দন ধ্বনিত হইতে লাগিল।

মেঘনাদবধ কাব্যের অষ্টম সর্গে কবি ভার্জিল, দান্তে ও মিলটনের অনুসরণ করিয়া স্বর্গ-নরকের চিত্র আঁকিয়াছেন। কিন্তু কবির নরক-বর্ণনা কৃত্রিম হইয়া পড়িয়াছে, সর্গটির মধ্যে বীভৎস রসের প্রাধান্য ঘটায়, ইহা তেমন আকর্ষণীয় হয় নাই। সর্গটির মধ্যে আয়োজনের যত চমক আছে, রসপ্রেরণার তেমন স্ফূর্তি নাই। দান্তের ডিভাইন কমেডির মধ্যবর্তী নরক-বর্ণনা পাঠকের মনে যে ধরণের কল্পনার আবেশ সৃষ্টি করে, সে-বর্ণনা পাঠককে যেভাবে স্তম্ভিত করিয়া দেয়,—মধুসূদনের প্রেতপুরীর বর্ণনা সেরূপ হইয়া উঠে নাই।

মেঘনাদবধ কাব্যের অষ্টম সর্গে পাশ্চাত্যের বিভিন্ন মহাকাব্য হইতে আহরণ করিয়া কবি কতকগুলি প্রেতপুরীর চিত্র গাঁথিয়া দিয়াছেন মাত্র। প্রেতপুরীর ঐ বর্ণনাকে রসোত্তীর্ণ করিয়া তুলিবার জন্য অন্তর হইতে স্বতঃ উৎসারিত যে অনুরাগের প্রয়োজন হয়, সেই অনুরাগটুকু কবি উহার সহিত মিশাইতে পারেন নাই। কবি নিজেও এ বিষয়ে সচেতন ছিলেন। তাই এই সর্গ সম্বন্ধে তিনি একখানি পত্রে লিখিয়াছিলেন—

There is an intellectual treat in store for you, my boy!

এই 'Intellectual treat' সৃষ্টি করিতে গিয়া কবি এখানে কেবল 'হঠাৎ আলোর ঝলকানি'ই দেখাইয়াছেন, উহা পাঠকের হৃদয়ানুভূতিকে কোনও আনন্দক্ষেত্রের অভিমুখীন করিয়া তুলিতে পারে নাই।

মহাকাব্য বিচারে মেঘনাদবধ কাব্য

কাব্যকে মোটামুটি দুই ভাগে ভাগ করিয়া দেখা হইয়া থাকে। গীতিকাব্য ও মহাকাব্য। সাহিত্যশিল্পের ক্ষেত্রে মহাকাব্য একটি বিশেষ রূপসৃষ্টি। বিভিন্ন যুগে ও ভিন্ন ভিন্ন দেশে বিভিন্ন কবিপ্রতিভাকে আশ্রয় করিয়া মহাকাব্য রচনার ধারাটি অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে। আধুনিক কালে নানা কারণে এই জাতীয় কবিতাশিল্প আর গড়িয়া উঠিতেছে না বটে, কিন্তু জগতের বহু প্রতিভাশালী কবি মহাকাব্য রচনা করিয়া পৃথিবীতে তাঁহাদের অবিস্মরণীয় কীর্তি রাখিয়া গিয়াছেন। প্রাচীন গ্রীসে হোমার-কর্তৃক ইলিয়াড্‌, ওডেসী রচিত হইয়াছিল, প্রাচীন ভারতে ব্যাস বাল্মীকির দ্বারা মহাভারত ও রামায়ণ এই দুইটি মহাকাব্য রচিত হইয়াছিল। অপেক্ষাকৃত পরবর্তী কালে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে এবং ভারতেও মহাকাব্য রচিত হইয়াছে। উহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ইতালীয় কবি ভার্জিলের ইনিড্‌, দান্তের ডিভাইন কমেডি, ট্যাসোর জেরুজালেম ডেলিভার্ড, মিলটনের প্যারাডাইস লষ্ট, ভারতের অমর কবি কালিদাসের রঘুবংশম্‌।

মহাকাব্য রচনার কয়েকটি নির্দিষ্ট নিয়ম আছে। যে কাব্যে কবির নিজের সুখদুঃখ, অনুভূতি, অভিজ্ঞতা ও কল্পনার কথা ব্যক্ত হয়, তাহা গীতিকাব্য। যে কাব্যে একটা সমগ্র দেশের, একটি জাতির বা একটি বিশিষ্ট যুগের মর্মবাণী ধ্বনিত হইয়া ওঠে, তাহাই মহাকাব্য। মহাকাব্য রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'বৃহৎ সম্প্রদায়ের কথা'। মহাকাব্যের ভিতর দিয়া একটি সমগ্র দেশ বা জাতি, একটি সমগ্র যুগ, আপনার হৃদয়, আপনার অভিজ্ঞতাকে ব্যক্ত করিয়া তাহাকে মানবের চিরন্তন সামগ্রী করিয়া তোলে। মহাকাব্য দেশ, জাতি বা ধর্মের গৌরবগানে পরিপূর্ণ কাব্য। ইহা গীতিকবিতার মত ব্যক্তিনিষ্ঠ রচনা নহে, ইহা বস্তুনিষ্ঠ রচনা। মহাকাব্যে কবির আত্মবাণী অপেক্ষা, বিষয়বস্তু ও সেই বিষয়বস্তু-বিন্যাসের কৌশলই মুখ্য। ইহা লেখকের আন্তর অনুভূতির প্রকাশ নহে। দেশের ঐতিহ্য মহাকাব্যের বীজ, দেশের ভবিষ্যৎ ইতিহাস সংগঠনে মহাকাব্যের সার্থকতা। ইহা গীতিকাব্যের মত বাঁশীর ললিত রাগিণী শুনায়

না, শুনায় যুদ্ধবিগ্রহের তূযনিনাদ। ইহা মহাকায়, মহিমোজ্জ্বল ও ব্যাপক,—অর্থাৎ, ইহার আকৃতি বিশাল, ঘটনাবস্তু বিরাট্, চারিত্রিক সমুন্নতি বিস্ময়কর। হিমাদ্রির মহামহিম কান্তির মতই উহা ধীর গম্ভীর প্রশান্ত সমুন্নত ও মহত্ত্ব-ব্যঞ্জক। ইহাতে কবির কল্পনা তুঙ্গারোহ।

মহাকাব্যের ঘটনাবর্ত জটিল—উহাতে বহু চরিত্রের সমাবেশ। কিন্তু তৎসত্ত্বেও উহার মধ্যে একটা Unity বা অখণ্ড শিল্পসঙ্গত সৌন্দর্যবোধ ও মহত্ত্বব্যঞ্জক গাম্ভীর্য রক্ষা করা প্রয়োজন। মহাকাব্যের শিল্পের মধ্যে এমন একটা সংযম ও সমগ্রতা থাকে যে, তাহাতে সমগ্র কাব্যখানি রূপে রসে সমুজ্জ্বল একটি শতদল পদ্মের মত বিকশিত হইয়া উঠে।

প্রাচ্যের আলঙ্কারিকগণের মতে মহাকাব্য আখ্যানমূলক সৃষ্টি। ইহার আরম্ভ ইষ্টদেবতার স্তুতিতে। ইহার আখ্যানবস্তু ইতিহাস পুরাণের কোন প্রসিদ্ধ বৃত্তান্ত। মহাকাব্যের নায়ক ইন্দ্রাদি প্রধান দেবতা অথবা সদ্বংশজাত ধীরোদাত্ত গুণসম্পন্ন কোন ক্ষত্রিয় নরপতি। মহাকাব্যের সর্গসংখ্যা অন্যূন আট—সর্গগুলি নাতিদীর্ঘ ও নাতিহ্রস্ব হওয়া বিধেয়। মহাকাব্যের মূল আখ্যানবস্তুর সহিত স্বভাবের শোভা, নরপতি ও সেনাপতিদিগের মন্ত্রণা, সৈন্যচালনা ও যুদ্ধ,—জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ,—বিরহ, মিলন,—ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, এই চতুর্বর্গ ও উৎসব,—ঋতুবর্ণনা প্রভৃতির মধ্যে সমুদয়ই, অথবা কোন কোনটি সংযুক্ত হয়। প্রত্যেক সর্গের শেষে পরবর্তী সর্গের আভাস প্রদান করিতে হয়। বর্ণনীয় বিষয় অথবা নায়ক-নায়িকার নামে মহাকাব্যের নামকরণ হইয়া থাকে। ইহার পটভূমি স্বর্গ মর্ত্য পাতাল। ইহাতে বীর, করুণ, আদ্য, শান্ত—এই চারিটি রসের কোন একটির প্রাধান্য থাকে, অন্য তিনটি রস অপ্রধান ও অস্থায়িভাবে বিরাজিত থাকে। মহাকাব্যের সর্গগুলি একরূপ ছন্দে রচিত হয়, তবে বিভিন্ন ছন্দে প্রকৃতি, যুদ্ধবিগ্রহ বা স্বর্গ মর্ত্য পাতালের বিশেষ বর্ণনা থাকিতে পারে। মহাকাব্যের ভাষা ওজস্বী, গাম্ভীর্যব্যঞ্জক।

ইউরোপীয় আলঙ্কারিকদের মতেও উপাখ্যান বা একটা সুসম্বদ্ধ আখ্যায়িকাই মহাকাব্যের প্রাণ। তাঁহাদের মতে ইহা আদি মধ্য ও অন্ত সমন্বিত বর্ণনাত্মক কাব্য। তাঁহারা বলেন—বিরাট্ এক ঘটনাকে অবলম্বন করিয়া এপিক বা মহাকাব্য রচিত হইবে, উহার পটভূমিতে থাকিবে জাতীয় জীবনের ইতিহাস

অথবা পৌরাণিক কোন ঘটনা। মানবজীবনের সহিত গ্রথিত হইবে দেব দানবের অতিলৌকিক লীলা। এপিকের নায়ক জাতীয় বীর, তাঁহার জীবনের আদর্শ উচ্চ, তাঁহার জীবন প্রদীপ্ত মহিমায় সমুজ্জ্বল। ইহার ভাষা ওজস্বী, উপমা ও অনুপ্রাসবহুল। ইহা একই ছন্দে আদ্যোপান্ত রচিত হইবে—সে ছন্দ হইবে প্রবহমান, ধ্বনিসম্পদে পরিপূর্ণ।—

"It is a narrative in form and employs a single metre."

—Aristotle.

শব্দসম্পদ্ এবং শব্দের বিন্যাসকৌশল সার্থক এপিকের অপরিহার্য অঙ্গ। শব্দের ধ্বনির দ্বারা একটা গম্ভীর ভাব সৃষ্টি করা এপিকের কাজ।

এপিকের মধ্যে বৈচিত্র্য থাকা প্রয়োজন—এবং নাটকের যাহা প্রাণ, ঘটনা ও নিপুণ চরিত্রাঙ্কন, তাহাও না থাকিলে কোন রচনা মহাকাব্য বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। এরিষ্টটল বলিয়াছেন,—এই নাটকীয় গুণ না থাকিলে তাহা উৎকৃষ্ট এপিক হইতে পারে না। এপিকের সংজ্ঞা নির্দেশ করিতে গিয়া তিনি গল্পাংশকে বাদ দিয়া কাব্যান্তর্গত চরিত্রসৃষ্টিকেই প্রাধান্য দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মতে চরিত্রের নাটকীয়ত্বেই এপিকের মাধুর্য ও উৎকর্ষ নির্ভর করে। শব্দসম্পদের দ্বারাই এপিকের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হইয়া থাকে। বাছিয়া বাছিয়া এপিক-রচয়িতাকে শব্দ প্রয়োগ করিতে হয়—ধ্বনির মধ্য দিয়া মনের মধ্যে একটা উদাত্ত-গম্ভীর ভাব জাগাইয়া তোলাই এপিক-রচয়িতার কর্তব্য।

পাশ্চাত্ত্যের আলঙ্কারিকগণ এপিক কাব্যের সংজ্ঞা দিতে গিয়া আরও বলিয়াছেন—এপিকের লেখক ইতিহাস পুরাণের অনুবর্তী হইয়া কাহিনী সৃষ্টি করিবেন বটে, কিন্তু এ বিষয়ে তাঁহার যথেষ্ট স্বাধীনতাও আছে। এপিকের চরিত্রসমূহ ঐতিহাসিক হইয়াও ইতিহাস-বর্ণিত কার্যকলাপের একটিও না করিতে পারেন। এমন কি, এপিকে তাঁহাদের ঐতিহাসিক কীর্তিসমূহের উল্লেখ পর্যন্ত না থাকিতে পারে। এপিক কবি ঐতিহাসিক বা পুরাণান্তর্গত আখ্যায়িকা ও চরিত্রের সহিত স্বীয় কল্পনা যদৃচ্ছা মিশ্রিত করিয়া কাব্যরচনা করিতে পারেন। কিন্তু সেক্ষেত্রে এপিক-কবিকে দেখিতে হইবে যে, তাঁহার সৃষ্টির উপাখ্যানভাগ এবং উপাখ্যানের অন্তর্গত চরিত্রসমূহ যেন স্বদেশীয় ও স্বজাতীয় হয়। চরিত্রসমূহের মধ্যে এমন অসাধারণ ক্ষমতা ও এমন মহোচ্চ গুণাবলী থাকা চাই, যাহার

সহিত লৌকিক সংস্কার জড়িত থাকে। যাহা ঘটিয়াছে, তাহার যথাযথ বর্ণনা এপিকের লক্ষণ নহে। ঘটনাবলীর মধ্যে থাকা চাই যাহা অভূতপূর্ব, চির-বিস্ময়কর, গৌরবময় ও হৃদয়োন্মাদক।

পাশ্চাত্ত্যের আলঙ্কারিকেরা মহাকাব্য বা এপিককে দুইটি বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করিয়াও দেখিয়াছেন—Epic of Growth এবং Epic of Art। Epic of Growth-এ ধরা পড়ে সমগ্র জাতির চিন্তাধারা, ভাব-ভাবনা ও ঐতিহ্য। এই শ্রেণীর মহাকাব্য একাধারে কাব্য ও ইতিহাস। ইহা সমস্ত দেশের হৃৎপদ্ম হইতে আপনা আপনি সমুদ্ভূত হয়, ক্ষীরোদসমুদ্রে শ্বেতপদ্মাসীনা সরস্বতীর বরমূর্তির মতো তাহা সমগ্র দেশের হৃৎপদ্ম জুড়িয়া বাস করে। ইহা একদিকে যেমন দেশকালের অন্তর হইতে বিকশিত হইয়া উঠে, তেমনি আবার অন্যদিকে তাহা সমগ্র দেশকে সৌরভসৌন্দর্যে পুলকিত ও উজ্জ্বল করিয়া তুলে। রামায়ণ, মহাভারত, ইলিয়াড্ ও ওডেসী হইতেছে Epic of Growth। ব্যাস বাল্মীকি ও হোমারের যুগে প্রাচীনতম যে সকল কাহিনী মুখে মুখে বা গায়কদিগের দ্বারা বহুকাল ধরিয়া প্রচারিত হইয়া আসিতেছিল, সেগুলি অমিতপ্রতিভাশালী কবিবিশেষ একত্র করিয়া এক একটি সুবৃহৎ কাব্য রচনা করিয়া গিয়াছেন।

Epic of Art শিল্পসৃষ্টি। উহা পুরাতনকে অবলম্বন করিয়া নূতন সৃষ্টি। এই ধরণের কাব্য কবির ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের আভায় প্রোজ্জ্বল। ব্যক্তিগত হৃদয়োচ্ছ্বাস এবং ব্যক্তিগত আবেগ Epic of Art-এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। কল্পনার ঐশ্বর্য এই শ্রেণীর মহাকাব্যের অপরিহার্য অঙ্গ। মিলটনের প্যারাডাইস লষ্ট, ভার্জিলের ইনিড, কালিদাসের রঘুবংশম্—Epic of Art। মধুসূদনের মেঘনাদবধ কাব্যকে এই Epic of Art-এর পর্যায়ভুক্ত করিয়াই দেখিতে হয়।

মহাকাব্য রচনা বাংলা সাহিত্যের বহুকালপ্রচলিত প্রথা নহে। বাংলা সাহিত্যে মঙ্গলকাব্য রচিত হইত—মঙ্গলকাব্যসমূহে মহাকাব্যের কোন কোন লক্ষণ বর্তমান থাকিলেও, মঙ্গলকাব্যগুলি মহাকাব্য নহে। গীতিকবিতাই অতি প্রাচীনকাল হইতে বঙ্গসাহিত্যের প্রধান গৌরবস্থল। কিন্তু খ্রীষ্টীয় ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগে বাংলা সাহিত্যে মহাকাব্য রচনা আরম্ভ হয়। ইহার কারণ—উনিশ শতকে বাঙ্গালী পাশ্চাত্ত্যের শিক্ষা, সভ্যতা, সাহিত্য

ও সংস্কৃতির সংস্পর্শে আসে। পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের সহিত সংস্পর্শের সেই প্রথম যুগে বাঙ্গালীর নিকট নূতন কল্পনা কবিত্বের জগৎ উদ্ঘাটিত হইয়া যায়। কিন্তু বাঙ্গালী তখনও শেলী কীটস প্রভৃতি রোমান্টিক কবিদিগের সহিত সম্যক পরিচয় লাভ করে নাই। তখনও বঙ্গসাহিত্যে অষ্টাদশ শতকের পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের প্রবল প্রভাব। অষ্টাদশ সাহিত্যের সেই ক্লাসিক আদর্শে দীক্ষিত হইয়া বাঙ্গালী কবিগণ সে যুগে মহাকাব্য রচনাকেই শ্রেষ্ঠ কবি-প্রতিভা বিকাশের উপযুক্ত ক্ষেত্র বলিয়াই মনে করিয়াছিলেন। পাশ্চাত্ত্য মহাকাব্যের কল্পনাদর্শ ও ভাবমাধুর্য, বর্ণনার সৌন্দর্য, গাম্ভীর্য বাঙ্গালীকে তখন বেশী করিয়া মুগ্ধ করিয়াছিল। হোমার, ভার্জিল, দান্তে, ট্যাসো প্রভৃতির রচনা অনুশীলনের মধ্য দিয়া বাঙ্গালীর মন মহাকাব্যেরই অনুরাগী হইয়া পড়িয়াছিল।

তখন আখ্যানমূলক কাহিনী রচনার জন্য বাংলা গদ্য বা উপন্যাস সাহিত্য পরিপুষ্ট হইয়া উঠে নাই। অথচ কবিপ্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তিমাত্রেরই মন তখন নূতন নূতন আদর্শে, ভাবে ও দীর্ঘ কাহিনীতে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। এরূপ ক্ষেত্রে সেকালের স্রষ্টা শিল্পীরা দেখিলেন যে, একমাত্র মহাকাব্যের সাহায্যেই একটি বৃহৎ কাহিনী প্রকাশ করা সম্ভবপর। উহাই সে যুগের বাংলার কবিদিগকে মহাকাব্য রচনায় প্রণোদিত করিল।

উনবিংশ শতাব্দীতে যে কয়টি বাংলা মহাকাব্য রচিত হইয়াছিল সেগুলি পাশ্চাত্ত্য মহাকাব্যের আদর্শে রচিত। মধুসূদনের মেঘনাদবধ কাব্য বাংলা সাহিত্যে প্রথম মহাকাব্য। পাশ্চাত্ত্য মহাকাব্যসমূহের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া মধুসূদন তাঁহার মেঘনাদবধ মহাকাব্যখানি রচনা করেন। মেঘনাদবধ কাব্যে গ্রীক মহাকাব্য রচনার রীতি অনুসৃত হইয়াছে। প্রাচ্যের রামায়ণ মহাভারত যে রীতির মহাকাব্য, মেঘনাদবধ কাব্যে সে রীতিভঙ্গি অনুসৃত হয় নাই। রামায়ণ ও মহাভারতে এক একটি ঘটনাকে আশ্রয় করিয়া পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তাহার বর্ণনায় কবিগণ অগ্রসর হইয়াছেন। কিন্তু হোমার তাঁহার ইলিয়াড কাব্যে ট্রয় যুদ্ধের শেষ কয়েক মাসের ঘটনা অবলম্বন করিয়া তাঁহার মহাকাব্য রচনা করিয়াছেন। এরিস্টটল বলিয়াছেন—মহাকাব্যের কবি কাব্যের প্রারম্ভেই ঘটনাসমুদ্রের মাঝখানে ঝাঁপ দিয়া পড়িবেন। মহাকাব্য রচনার ঐ রীতিটি মধুসূদনের বড়ই পছন্দ হইয়াছিল। মেঘনাদবধ কাব্যে

কবি তাই ঐ রীতিরই অনুসারী। গ্রীক আদর্শে প্রভাবিত হইয়া কবি মেঘনাদবধ কাব্যে লঙ্কাসমরের খণ্ডাংশকেই তাঁহার বক্তব্যরূপে ব্যবহার করিয়াছেন।

মহাকাব্য রচনায় মধুসূদনের উপর মিলটনের প্রভাবও কম নহে। ছন্দ-সৃষ্টি বিষয়ে এবং রচনাপদ্ধতি নির্ধারণ বিষয়েও তিনি মিলটনের অনুবর্তী হইয়াছেন। মহাকাব্যের কবির স্বভাবতই বীররসপ্রীতি থাকে, বীররস উৎসারণেই মহাকাব্যের কবির প্রতিভা নিয়োজিত হয়। এই বীররস দুই উপায়ে উৎসারিত হইতে পারে—যুদ্ধবর্ণনার মধ্য দিয়া, অথবা চরিত্র ও চিত্রের মধ্য দিয়া বীরত্বের বিকাশ দেখাইয়া। হোমারে প্রথম রীতিটি অনুসৃত হইয়াছে, মিলটনে দ্বিতীয় রীতিটি অনুসৃত হইয়াছে। মেঘনাদবধ কাব্য রচনাকালে কাব্যমধ্যে বীররস উৎসারিত করিতে গিয়া মধুসূদন হোমারের রীতিটিকে অনুসরণ করেন নাই। তিনি ক্রমাগত যুদ্ধবর্ণনার মধ্য দিয়া বীররস উৎসারিত না করিয়া, মিলটনের মত চরিত্রগুলিকেই বীরত্বব্যঞ্জক করিয়াছেন।

পাশ্চাত্ত্য মহাকাবের ভাব, আখ্যায়িকা, বহু চরিত্র অল্পবিস্তর পরিবর্তিত আকারে মেঘনাদবধ কাব্যে দেখা গিয়াছে। শব্দসম্পদ ইউরোপীয় এপিকের মূল উপাদান। মধুসূদনের মেঘনাদবধ কাব্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদ হইয়াছে ইহার শব্দাবলী, শব্দের অন্বয়। সকল প্রকার রসকে তিনি ধ্বনির সহায়তায় ফুটাইয়া গিয়াছেন। মেঘনাদবধ কাব্যের সীতা ও সরমার কথোপকথন পাশ্চাত্ত্য এপিকের episode-এর আদর্শে রচিত। এরিস্টটলের মতে এপিক কাব্যের আদি মধ্য ও অন্ত সরলভাবে কাব্যের উদ্দেশ্য ও ঘটনাবলী বর্ণনা করিবে। মধুসূদনের মেঘনাদবধ কাব্যখানি যেন এই নিয়মে সুরে বাঁধা হইয়াছে। পাশ্চাত্ত্য মহাকাব্যের সংযম ও সমগ্রতার ঐকতান সঙ্গীত মেঘনাদবধ কাব্যে কবি অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হইয়াছেন। এ কাব্যে সুগ্রথিত কল্পনা ও কবিত্বের স্রোত প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত প্রবাহিত। মহাকাব্যের প্রেরণা, মাধুর্য ও কল্পনাদর্শ এ কাব্যে বিশেষভাবেই বর্তমান।

কিন্তু তৎসত্ত্বেও এ কাব্যখানি পূর্ণপরিণত একটি মহাকাব্য হইয়া উঠে নাই। এ কাব্যের ঘটনাবস্তু জটিল বা বিস্তৃত নহে। রূপরসের সূক্ষ্মতা ইহাতে কোথাও নাই,—অশ্রু-হাসি, জয়-পরাজয়, কোমল-কঠোর, রুদ্র-

বিরাটের সরল প্রবাহই ইহার বিশেষত্ব। জয়োল্লাসের পরিবর্তে এ কাব্যখানি ট্র্যাজেডীর করুণরসে অভিষিক্ত হইয়াছে। মেঘনাদের হত্যা, রাবণের শোক, লঙ্কার শোকাবহ পরিণাম—কোনটিতেই মহাকাব্যোচিত বিষয়গৌরব নাই।

একটি মূল কারণে এরূপ হইয়াছে। এপিকের অনুরাগী হইলেও মধুসূদনের কবিমানস ছিল রোমান্টিক। তাই মেঘনাদবধ কাব্যে প্রবল গীতিপ্রেরণাই কাজ করিয়াছে। অনেক স্থানেই কবির ব্যক্তিগত হৃদয়োচ্ছ্বাস ফুটিয়া উঠিয়া এ কাব্যে লিরিক ভাবাবেগ প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। মেঘনাদবধ কাব্যে বাহিরের বস্তুজগৎ হইতে,—পুরাণ হইতে রচনার উপকরণ সমাহৃত হইয়াছে সত্য, কিন্তু তৎসত্ত্বেও এ কাব্যের সমস্তটাই কবির ব্যক্তিগত হৃদয়োচ্ছ্বাস এবং আবেগের সৌন্দর্যে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে।

এ কাব্যের মূলগত ভাবটিই লিরিক। কাব্যখানি আত্মনিমগ্ন ভাবকল্পনার ফল—ইহার আদ্যোপান্ত লিরিক আবেগ ছাড়া আর কিছুই নহে। এই লিরিক ভাবটি রাবণের বিলাপে,—তাঁহার মমত্বে ও স্নেহপ্রবণতায়, রামের স্নেহবিহ্বলতায়, সীতার সহিষ্ণুতায়, প্রমীলার সহমরণ-যাত্রার করুণ দৃশ্যে এপিকের বাস্তব আবরণ ভেদ করিয়া উচ্ছ্বাস ফুটিয়া উঠিয়াছে। এ কাব্যে এপিক আবরণের তলে তলে অন্তঃসলিলা হইয়া লিরিকের ফল্গুস্রোত বহিয়া ইহাকে ঠিক মহাকাব্যের পর্যায়ভুক্ত হইতে দেয় নাই। মধুসূদনের মহাকাব্যখানি লিরিক ভাব-সমন্বিত মহাকাব্য, অথবা এমনও বলা যাইতে পারে যে,—মধুসূদনের মেঘনাদবধ কাব্য মহাকাব্যের আকারে লিখিত লিরিক কাব্য ছাড়া আর কিছুই নহে এবং উহাতেই এই কাব্যের সৌন্দর্য, উহাতেই এ কাব্যের গৌরব।

মেঘনাদবধ কাব্যের প্রধান রস

মহাকাব্য রচনায় মধুস্দনের আদর্শ ছিলেন হোমার। পাশ্চাত্ত্য মহাকাব্যে, বিশেষত হোমারের ইলিয়াডে বীররসই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। মধুস্দন উহারই অনুসরণে তাঁহার মেঘনাদবধ কাব্যকে বীররসপূর্ণ কাব্য করিয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন। কাব্যারম্ভে তাই বাগ্‌দেবী বীণাপাণিকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন—

উর তবে, উর, দয়াময়ী
বিশ্বরমে! গাইব, মা, বীররসে ভাসি'
মহাগীত; উরি, দাসে দেহ পদছায়া।

কিন্তু কাব্যরচনায় অগ্রসর হইয়া কবি তাঁহার সেই সঙ্কল্প রক্ষা করিতে পারেন নাই। এ কাব্যখানি বীররসের পরিবর্তে করুণরস-প্রধান হইয়াছে—স্থানে স্থানে বীররস উৎসারিত হইয়াছে মাত্র। বীর ও করুণরসের গভীরতা ও ব্যাপকতা বিচারে এ কাব্যখানিকে করুণরসাত্মকই বলিতে হয়।

মেঘনাদবধ কাব্যখানি শুধু যে বিয়োগাত্মক তাহা নহে, ইহা বিয়োগান্তও বটে। কাব্যের প্রারম্ভে যে করুণরস উৎসারিত হইয়াছে, শেষ সর্গ পর্যন্ত তাহাই বহিয়া গিয়াছে;—প্রথম সর্গে বীরবাহুর মৃত্যুতে রাবণ ও চিত্রাঙ্গদার মর্মভেদী বিলাপে যে শোকগাথার স্থচনা হইয়াছে, শেষ সর্গে মেঘনাদের মৃত্যু এবং প্রমীলার চিতারোহণে এবং রাবণের অশ্রুবিসর্জনে তাহার পরিসমাপ্তি ঘটিয়াছে। একমাত্র সপ্তম সর্গে যুদ্ধ-বর্ণনা আছে। অন্যান্য সকল সর্গে কেবল যুদ্ধের আয়োজন এবং সেই আয়োজনের ঘটনার অন্তরালে নিয়তি-লাঞ্ছিত মানবজীবনের নৈরাশ্য এবং পরাজয়ের দীর্ঘশ্বাসই শ্বসিত হইয়াছে। বীররসের স্থায়িভাব উৎসাহ-উদ্দীপনার পরিবর্তে এ কাব্যে করুণরসের স্থায়িভাব শোকই অধিক প্রকট হইয়া উঠিয়াছে।)

এ কাব্যের সকল উৎকৃষ্ট অংশেই করুণরস প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। বিরহকাতরা সীতার নীরব রোদনধ্বনি, মেঘনাদ প্রমীলার ভাগ্যবিড়ম্বনা, রামের সৌভ্রাত্র ও স্নেহাধিক্য, শক্তিশেলাহত লক্ষ্মণের পাশে রামের উচ্ছ্বসিত

ক্রন্দন, রাবণের আক্ষেপোক্তিসকল, অথবা শ্মশান-চিতাগ্নির পার্শ্বে অপ্রতিহত-প্রভাব রাবণের হৃদয়ভেদী বিলাপই কাব্যখানির প্রাণসত্তা।

পুত্রশোকাতুর রাবণের করুণ শোকদৃশ্যে কাব্যের সূচনা। রাজসভায় দূতের মুখে বীরবাহুর মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া রাবণ বিলাপ করিয়াছেন। পরে প্রাসাদশীর্ষ হইতে যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করিয়াও তাঁহার মনে শোকাবেগই উৎসারিত হইয়াছে। সেতুবন্ধ সাগরের প্রতি দৃষ্টিপাত হওয়ায় তিনি যখন বলিয়াছেন—

> উঠ, বলি! বীরবলে এ জাঙাল ভাঙি,
> দূর কর অপবাদ ; জুড়াও এ জ্বালা,
> ডুবায়ে অতল জলে এ প্রবল রিপু।
> রেখো না গো তব ভালে এ কলঙ্ক-রেখা,
> হে বারীন্দ্র, তব পদে এ মম মিনতি।

তখন সে উক্তিতে সাগরের প্রতি উৎসাহবাণী উচ্চারিত হইলেও, রাবণের অন্তরের আক্ষেপই উহার মধ্য দিয়া প্রকাশিত হইয়াছে। উহা করুণ অনুনয়ের সুরে পরিপূর্ণ।

প্রাসাদশীর্ষ হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া রাবণ যখন রাজসভায় পুনরায় অধিষ্ঠিত হইয়াছেন, তখন বিষন্নতার প্রতিমূর্তি পুত্রহারা চিত্রাঙ্গদা সেখানে প্রবেশ করিয়া বিলাপ করিয়াছেন। এ অংশও শোককাতরা মাতার করুণ বিলাপে পরিপূর্ণ।

কেবলমাত্র সর্গশেষে কবি বীররসের অবতারণা করিয়াছেন। প্রমোদোদ্যান হইতে প্রমীলার নিকট বিদায় গ্রহণকালে মেঘনাদের বীরত্বব্যঞ্জক উক্তি, এবং পিতার প্রতি তাঁহার উৎসাহবাক্য উদাত্তগম্ভীর হইয়া উঠিয়াছে।

কাব্যের দ্বিতীয় সর্গে আত্মপ্রত্যয়শীল বীর মেঘনাদকে বধ করিবার জন্য দেবতাদের ষড়যন্ত্র অন্তরকে বিষাদাচ্ছন্ন করিয়া তুলে। প্রথম সর্গে মেঘনাদের সহিত প্রথম সাক্ষাৎকারেই পাঠকচিত্তে ঐ বীরের প্রতি একটা সহানুভূতি জন্মিয়াছিল। সেই বীরের জীবনের নিষ্ফল পরিণামের সম্ভাবনা এ কাব্যের দ্বিতীয় সর্গে ফুটিয়া উঠায়, সর্গটি করুণ হইয়া উঠিয়াছে। দ্বিতীয় সর্গে ভয়ানক এবং শৃঙ্গার রসের অবতারণাও কবি করিয়াছেন। যখন মদন-কর্তৃক সম্মোহন শরে ধ্যানমগ্ন মহাদেব বিদ্ধ হইয়াছেন তখন—

শিহরিলা শূলপাণি। লড়িল মস্তকে
জটাজুট, তরুরাজি যথা গিরিশিখরে
ঘোর মড় মড় রবে লড়ে ভূকম্পনে।
অধীর হইলা প্রভু! গরজিলা ভালে
চিত্রভানু, ধকধকি উজ্জ্বল জ্বলনে!
ভয়াকুল ফুলধনুঃ পশিলা অমনি
ভবানীর বক্ষস্থলে; পশয়ে যেমতি
কেশরি-কিশোর ত্রাসে, কেশরিণী-কোলে
গম্ভীর নির্ঘোষে ঘোষে ঘনদল যবে,
বিজলী ঝলসে আঁখি কালানল তেজে!

এ বর্ণনা ভয়ানক রসাত্মক। পার্বতীর মোহিনী বেশ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া মহাদেব সেখানে প্রেমামোদে মাতিয়া উঠিয়াছেন, সেই অংশ শৃঙ্গার রসাত্মক।

তৃতীয় সর্গের প্রারম্ভে বিরহিণী প্রমীলার বর্ণনায় করুণরসের অবতারণা, কিন্তু তাঁহার লঙ্কাপ্রবেশের দুর্জয় সঙ্কল্পে ও 'কৃষ্ণ হয়ারূঢ়া' হইয়া লঙ্কার অভিমুখে যাত্রার দৃশ্যে বীররসের উজ্জ্বল চিত্র। সর্গটি করুণরসে সমাপ্তি লাভ করিয়াছে। কবি যেভাবে প্রমীলা ও মেঘনাদের মিলনদৃশ্য বর্ণনা করিয়া, তাহার পর পার্বতীর মুখ দিয়া মেঘনাদ ও প্রমীলার জীবনে বিপদের পূর্বাভাস দিয়াছেন, তাহাতে সর্গশেষে পাঠকের মন বিষাদব্যথায় ক্লিষ্ট হইয়া উঠে।

চতুর্থ সর্গের প্রারম্ভে যুদ্ধের উৎসাহ দেখা গিয়াছে। ' দেবদৈত্য-নরত্রাস মেঘনাদকে সেনাপতিপদে বরণ করায় লঙ্কাবাসিগণ সেখানে আশায় উদ্দীপনায় উল্লসিত হইয়া উঠিয়াছে।

সর্গটির এই সূচনা-অংশটুকু বীররসাত্মক। কিন্তু অন্যদিকে বিরহিণী সীতার অন্তবিহীন দুঃখ, তাঁহার করুণ ক্রন্দন সূচনায় সেই বীররসকে আচ্ছন্ন করিয়া ম্লান করিয়া দিয়াছে। সীতার করুণ কান্তি এ সর্গে বীররসের দীপ্তছটাকে প্রতিহত করিয়া প্রাধান্য লাভ করিয়াছে।

পঞ্চম সর্গে লক্ষ্মণের চণ্ডীর দেউল অভিমুখে যাত্রার দৃশ্য বীর ও রৌদ্ররসে পূর্ণ বটে, কিন্তু রামের স্নেহব্যাকুলতা উৎসাহ-উদ্দীপনাবিহীন, অত্যন্ত করুণ। রাবণের প্রধানা মহিষী মন্দোদরীর মমত্ব এই চরিত্রটিকে করুণ করিয়া তুলিয়াছে। প্রমীলার মধ্যে এই সর্গে বীরত্বের আভাসটুকু ফুটিয়া উঠিয়াই মিলাইয়া

গিয়াছে। চরিত্রটিতে আশা-আশঙ্কার সংশয়-দোলায় আন্দোলিত করুণ মনোহারিত্বটুকুই বেশী করিয়া চোখে পড়িয়াছে।

ষষ্ঠ সর্গে মেঘনাদের বীরত্ব। কিন্তু সমস্ত বীরত্বকে অতিক্রম করিয়াছে অবস্থাঘটিত একটি সুগভীর কারুণ্য। সপ্তম সর্গে পুত্রশোকাতুর রাবণের যুদ্ধসজ্জায় এবং দেবগণের সহিত রণে বীররসের উৎসারণ হইয়াছে। পূর্বেই বলিয়াছি, এই একটিমাত্র সর্গে আগাগোড়া বীররসের ধারা প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে। অষ্টম সর্গে শক্তিশেলাহত লক্ষ্মণের জন্য বিলাপে অবিমিশ্র করুণরসই উচ্ছল হইয়া উঠিয়াছে। রামের নরকদর্শনদৃশ্যে বীভৎস রসের অবতারণা হইয়াছে। দশরথের সহিত রামের মিলনে সঞ্চারীরসে বাৎসল্যের সৃষ্টি হইয়াছে। মেঘনাদবধ কাব্যের সমগ্র নবম সর্গটিতে দিগ্বিজয়ী বীর মেঘনাদের করুণ পরিণামের জন্য শোকোচ্ছ্বাস স্থান পাইয়াছে। সে শোকব্যথা এমনই গভীর এবং ব্যাপক যে তাহা বর্ণনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া কবি বলিলেন—

> করি স্নান সিন্ধুনীরে রক্ষোদল এবে
> ফিরিলা লঙ্কার পানে আর্দ্র অশ্রুনীরে—
> বিসর্জি প্রতিমা যেন দশমী দিবসে!
> সপ্ত দিবানিশি লঙ্কা কাঁদিলা বিষাদে।

নায়কের জয় অথবা প্রতিষ্ঠার মধ্যে মহাকাব্যের পরিসমাপ্তি ঘটিয়া উহা যেভাবে বীররসপ্রধান হইয়া উঠে, মেঘনাদবধ কাব্যে উহার ব্যতিক্রম দেখিলাম। পরাজয়ের কারুণ্যই মেঘনাদবধ কাব্যের মূল বিষয়বস্তু হইয়াছে। যুদ্ধবর্ণনা এ কাব্যের গৌণ। ইহার আদ্যোপান্ত ব্যক্তিগত হৃদয়ের ক্রন্দনধ্বনি—বিভিন্ন চরিত্রের শোকোচ্ছ্বাস উৎসারিত হইয়া যুদ্ধের তূর্যনিনাদকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। কাব্যের মধ্যে দম্ভোলিগম্ভীর নাদ, অম্বুরাশিরব, জীমূতমন্দ্র, বীরেন্দ্রবৃন্দের হুঙ্কার, প্রভঞ্জনস্বন, কোদণ্ডটঙ্কার প্রভৃতি থাকিলেও, উহাদিগকে অতিক্রম করিয়া মর্মভেদী ক্রন্দনের করুণ রাগিণী উত্থিত হইয়াছে। করুণ বাঁশীর রাগিণী শঙ্খ ঘণ্টা দুন্দুভি ইত্যাদি রণবাদ্যকেও পরাভূত করিয়াছে।

এখন প্রশ্ন এই যে, এ কাব্যখানির প্রথমেই বীররসের বর্ণনা কবির লক্ষ্য হইয়া উঠা সত্ত্বেও কেন ইহা করুণ অশ্রুধারার প্লাবনে পরিপ্লাবিত হইয়া গিয়াছে? এরূপ হইবার কারণ, উনবিংশ শতাব্দীর একজন কবির পক্ষে

মহাকাব্যের ধর্মগুলি মানিয়া চলা সম্ভবপর ছিল না। তাই প্রকাশ্যে মহাকাব্য রচনার রীতি অনুসরণ করিয়া চলার সঙ্কল্প ঘোষণা করা সত্ত্বেও কবি সেই নিয়ম মানিয়া চলিতে পারেন নাই। কবি তাঁহার কাব্যের মধ্যে—'গাইব মা বীররসে ভাসি মহাগীত' বলিতেছেন; কিন্তু একখানি পত্রের মধ্যে বলিতেছেন—

I shall put down on paper the thoughts as they spring up in me, and let the world say what it will.

মেঘনাদবধ কাব্য মহাকাব্য হইবে, উহা কবির প্রকাশ্য সঙ্কল্প বটে, কিন্তু কবি তাঁহার বন্ধু রাজনারায়ণ বসুকে লিখিতেছেন—

You must not, my dear fellow, judge the work as a regular Heroic Poem. I never meant it as such. It is a story, a tale, rather heroically told.

Do not be frightened, my dear fellow, I won't trouble my readers with *vira rasa.*

সুতরাং মনে হয় যে, কাব্যারম্ভেই কবির মনে একটি দ্বিধা বা সংশয় ছিল। কবি মুখে যাহা প্রকাশ করিয়াছেন, অন্তরের অন্তঃস্থলে সেরূপ কোন প্রেরণাই তিনি অনুভব করেন নাই। তাই এরূপ হইয়াছে। তাই প্রকাশ্যে কাব্যখানিকে হোমারের আদর্শে রচনা করিবার সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়াও ইহাকে চিরকরুণ রামায়ণকথার সমধর্মী করিয়া ফেলিয়াছেন। কাব্যবিধির নির্দেশ অনুসারে এই কাব্যখানিকে তিনি বীররসের কাব্যরূপে রচনা করিবেন, একথা বলা সত্ত্বেও—অন্তরের প্রেরণায় ইহাকে করুণ রসাত্মকই করিয়া ফেলিয়াছেন এবং আপন অন্তরের প্রেরণার সার্থকতা দেখিয়া কবি বিস্মিত হইয়া বলিয়াছেন,—এমন করুণ-রসাত্মক কাব্য যে আমি লিখিতে পারি তাহা ত' জানিতাম না!—**I never thought I was such a fellow for the pathetic!**

মেঘনাদবধ কাব্যে মহাকাব্যোচিত গাম্ভীর্যকে অতিক্রম করিয়া যে করুণ গীতোচ্ছ্বাস উদ্‌গীত হইয়াছে, উহাই এ কাব্যখানিকে কেবল যুদ্ধবর্ণনাসঙ্কুল একখানি কাব্যে পরিণত হইতে দেয় নাই। উহাই এ কাব্যে সংগ্রাম-বিভীষিকাকে মন্দীভূত করিয়া পাঠকচিত্তকে এক উদার ভাবলোকে আকর্ষণ করিয়া লইয়া গিয়াছে। ইহা যুদ্ধবর্ণনা-পরিপূর্ণ একখানি কাব্য হইলে এমনটি হইত না।

ভাষা ও ছন্দ

। মধুসূদন ছিলেন অসাধারণ শব্দশিল্পী কবি। বাংলাভাষার শব্দসম্পদ্ তিনি বৃদ্ধি করিয়া গিয়াছেন। বহু নূতন শব্দ তিনি সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন, বহু যৌগিক এবং সমস্তপদ গঠন করিয়া এ ভাষার ঐশ্বর্য ও প্রকাশক্ষমতা তিনি বাড়াইয়া গিয়াছেন। রাঘব-বাঞ্ছা, কেশব-বাসনা, কেশরি-কিশোর, নিস্তারিণী-মনোহর, গোধুলি-ললাট, খদ্যোতিকা-দ্যুতি, কুঞ্জবন-গীতি ইত্যাদি শব্দ, অথবা কুসুম-কুন্তলা-মহী, কৃত্তিকা-কুল-বল্লভ-সেনানী, দ্বিরদ-রদ-নির্মিত, রঘুজ-অজ-অঙ্গজ, রতন-সম্ভবা-বিভা, কাঞ্চনসৌধকিরীটিনী-লঙ্কা, তারা-গাঁথা-সিঁথি, কবিচিত্ত-ফুলবন-মধু, নন্দন-কানন-গন্ধ-মধু, নির্ঝর-বারিরাশি, সৌর-কর-রাশি-বেশে, সৌর-খরতর-করজাল-সঙ্কলিত-আভাময় ইত্যাদি যৌগিক পদ মেঘনাদবধ কাব্যে সুপ্রচুর। মধুসূদনের ভাষার সব চেয়ে বড় লক্ষণ ইহার সঙ্গীতগুণ,—Phrasal Music। উল্লিখিত শব্দাবলী কবির কাব্যের সঙ্গীতমাধুর্য এবং ওজস্বিতা দুই-ই সম্পাদন করিয়াছে। মধুসূদনের আবির্ভাব-কালে কবি-ভাষা বলিতে যাহা বুঝা যায়, কাব্যরচনার সেই মূল উপাদান সঙ্গীতবিহীন ছিল। মধুসূদনের আবির্ভাবে এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। তাঁহার লেখনীমুখে বাংলা ভাষা ধ্বনিলাবণ্যে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। কবি তাঁহার কাব্যমধ্যে বহু অপ্রচলিত আভিধানিক সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করিয়া তাহাদের পুনর্জীবন দান করিয়াছেন। তাঁহার পূর্বে বঙ্গসাহিত্য রাম-রাবণের যুদ্ধবিগ্রহের কাহিনীতে মুখরিত ছিল বটে, কিন্তু সে ভাষায় জীমূতমন্দ্র, দুন্দুভিধ্বনি, দম্ভোলিনিনাদ, কলম্বকুলের শন্ শন্ শব্দ, কম্বুনাদ কিংবা অম্বুরাশিরব হইত না। মেঘনাদবধ কাব্যে অমরকোষের শব্দের প্রাচুর্য, এবং সে সকল শব্দ ভাষায় সঙ্গীতমাধুর্য সৃষ্টির প্রয়াসেই কবিকর্তৃক ব্যবহৃত হইয়াছে। ঐ সকল শব্দ ধ্বনিতরঙ্গ সৃষ্টির সহায়ক হইয়াছে, বীররস ও রৌদ্ররস প্রকাশের সহায়ক হইয়াছে,—রচনার গাম্ভীর্য ঐ সকল শব্দ সম্পাদন করিয়াছে।

নামধাতুর ব্যবহারের দ্বারা মধুসূদন বাংলাভাষার ক্রিয়াপদ বৃদ্ধি করিয়া

গিয়াছেন। নূতন ক্রিয়াপদ এবং ক্রিয়াবিশেষণ সৃষ্টির বিরাম তাহার ছিল না। ঘর্ঘরিত রথচক্র, ঝনঝনিল অসি পিধানে, মর্মরিল পাতাকুল, মুক্তিল (কত যে ফুলের দলে প্রমীলার আঁখি মুক্তিল শিশির-নীরে), বৃষ্টিল, নির্বীরিবে (নির্বীরিবে লঙ্কা আজি সৌমিত্রি কেশরী) প্রভৃতি শব্দ মেঘনাদবধ কাব্যে অজস্র। এই সকল শব্দের কোন কোনটি ব্যাকরণানুমোদিত নহে। যেমন—'বীরশূন্য করিবে' এই অর্থে নির্বীরিবে শব্দের প্রয়োগ ব্যাকরণের অনুমোদিত নহে। এইরূপ 'মুক্তাজড়িত হইল', বা 'মুক্তার মত শোভা পাইল'—এই অর্থে 'মুক্তিল' শব্দের প্রয়োগও ব্যাকরণদুষ্ট। কিন্তু মধুসূদন মিশ্র বা জটিল ভাবকে এক কথায় অল্পের মধ্যে প্রকাশ করার বাসনায় এইরূপ স্বাধীন পদসংগঠন প্রণালী অবলম্বন করিয়াছিলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইংরেজ লেখকদিগের উদ্‌ভাবনশক্তির ফলে ইংরাজি সাহিত্যে বহু নূতন ক্রিয়াপদের সৃষ্টি যেমন হইয়াছিল, মধুসূদনের উদ্‌ভাবনীশক্তির ফলেও ঠিক তেমনিভাবে বাংলা ভাষার ক্রিয়াপদের বৈচিত্র্য বর্ধিত হইয়াছিল।

মধুসূদনের ভাষা কি বর্ণনায়, কি চিত্রাঙ্কনে, কি অর্থনির্দেশে—সকল ক্ষেত্রেই সংক্ষিপ্ত হইয়াছে, সরলও হইয়াছে। একদিকে তিনি ভাষার ওজস্বিতা এবং সঙ্গীতগুণ সৃষ্টি করিতে যেমন অমরকোষের শরণাপন্ন হইয়াছেন, তেমনি কাশীরাম, কৃত্তিবাস, মুকুন্দরাম, ভারতচন্দ্র, কিংবা পাঁচালীকারগণের রচনার অন্তর্গত খাঁটি বাংলা শব্দ ব্যবহারেও তিনি কুণ্ঠাবোধ করেন নাই। মেঘনাদবধ কাব্যে ইহার প্রমাণ রহিয়াছে। ঐ কাব্যে জাঙাল, ঠাট, সাপটি, এড়িলা, দেউল, দেউটি, বোল, গুণনিধি, হাদে দেখ, ভেটিব, খেদাইনু, ফাঁফর প্রভৃতি খাঁটি বাংলা শব্দ কত যে ছড়াইয়া আছে তাহার সংখ্যা নাই। বার্নস, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, টেনিসন, য়েটস প্রভৃতি ইংরেজ কবিরা যেমন আটপৌরে ভাষাকে কবিতার মর্যাদায় এবং প্রয়োজনে সকল প্রকার ভাব প্রকাশের সামর্থ্য দান করিয়াছেন, মধুসূদনও ঠিক তেমনিভাবে বাংলা কবিতায় বাংলার নিজস্ব বাগ্‌ধারার অনুসরণ করিয়াছিলেন, দেশী শব্দ এবং ধ্বনিপ্রকৃতির সমাদর করিয়া গিয়াছেন।

কবি শব্দানুকারাত্মক এবং দৃশ্যানুকারাত্মক শব্দসৃষ্টিতেও ক্ষমতার পরিচয় রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার ভাষায় স্পষ্ট ইংরাজি প্রভাবও আছে। কবির অভ্রভেদী-গিরি-চূড়া, অম্বরিত পরাক্রম—মিলটনের 'heaven-kissing hill'

এবং 'Inly'—মনে করাইয়া দেয়। কবির 'দেবকুলপ্রিয়' এবং 'দম্ভোলি-নিক্ষেপী' হোমারের 'Favoured of the Gods' এবং 'Cloud-compelling Jove'-এর অনুরূপ। কবির 'কুন্তল প্রদেশে স্বনিছে ভীষণ সর্প' পাঠ করিয়া ভার্জিলের 'hissing snakes for the ornamental hair' স্মৃতিপথে উদিত হয়। কবি যখন বলেন—'পশে কি গো শোক হেন কুসুম হৃদয়ে',—তখন উহা ভার্জিলের 'Can such deep hate find place in breasts divine ?' এবং মিলটনের 'In heavenly spirits could such perversion dwell ?' মনে পড়ে। তাঁহার কাব্যে 'স্বর্গীয় সৌরভে দেশ পূরিল সহসা'-য় হোমারের 'A more than heavenly fragrance shed'-এর অনুরূপ পদবিন্যাস হইয়াছে। মেঘনাদবধ কাব্যের ভাষা এইরূপ অনুবাদ বা অনু-কৃতির মধ্য দিয়া কোন কোন ক্ষেত্রে সৃষ্ট হইয়া উঠিলেও এ কাব্যে ভাষা উহার সৌন্দর্য হারায় নাই।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে ধ্বনিসৌন্দর্যই মধুসূদনের ভাষার প্রধান গুণ। বিদেশী কাব্যের ভাব আপন মাতৃভাষায় যখন তিনি প্রবর্তন করিবার প্রয়াসী হইয়াছেন, তখনও ধ্বনিলাবণ্য অক্ষুণ্ণ রাখার প্রতি মধুসূদনের সজাগ সতর্ক দৃষ্টি ছিল। মেঘনাদবধ কাব্যের দ্বিতীয় সর্গের প্রারম্ভে সন্ধ্যাসমাগমের যে বর্ণনা আছে উহা যে মিলটন ও সেক্সপীয়ারের আদর্শে রচিত—এ স্বীকৃতি কবি নিজেই করিয়াছেন। কিন্তু পাশ্চাত্ত্যের ভাব বা বর্ণনা কবির লেখনীমুখে উহার বিজাতীয়তাটুকু হারাইয়া ফেলিয়াছে। কবির শব্দ-প্রয়োগের নৈপুণ্যই তাঁহার কাব্য হইতে এই বিজাতীয়তার বিলোপসাধনে সহায়তা করিয়াছিল। মেঘনাদবধ কাব্যের দ্বিতীয় সর্গের প্রারম্ভে আছে—

আইলা সুচারু তারা শশী সহ হাসি
শর্বরী ; সুগন্ধবহ বহিল চৌদিকে,
সুস্বনে সবার কাছে কহিলা বিলাসী
কোন্ কোন্ ফুল চুম্বি কি ধন পাইলা ?

কবি বলিতেছেন—These lines will no doubt recall to your mind the lines,

And whisper whence they stole
Those balmy spoils—

of Milton, and the lines

Like the sweet south

That breathes upon a bank of violets

Stealing and giving odour—

of Shakespeare. Is not 'চুম্বন' a more romantic way of getting the thing than Stealing ?

কাব্য-রচনায় প্রবৃত্ত হইয়া ভাষাকে মধুসূদন ভাবানুযায়ী রূপদান করেন। মেঘনাদবধ কাব্যের ভাষা কোথাও লঘুনৃত্যে বহিয়াছে, কোথাও মহাকাব্যোচিত গাম্ভীর্যে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। বীর ও করুণ ভাব প্রকাশ করিতে তিনি সম্পূর্ণ পৃথক পৃথক শ্রেণীর শব্দাবলী ব্যবহার করিয়াছেন। তাঁহার কাব্যের ভাষা ভাব অনুযায়ী বেশবিন্যাস করিয়াছে।

মধুসূদনের ভাষা কোথাও ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গীত, কোথাও স্বরবর্ণের সঙ্গীত। এক অনুপ্রাস ও যমকের সহায়তায় এই অসাধ্যসাধন কবিকর্তৃক সম্পাদিত হইয়াছে। কবি বুঝিয়াছিলেন যে, যমক-অনুপ্রাসই ভাষার লালিত্যবৃদ্ধির প্রধান উপায়। তাই কবি তাঁহার ভাষার লালিত্য অধিকাংশস্থলেই যমক-অনুপ্রাসের সহায়তায় ঘটাইয়া গিয়াছেন। এ সম্বন্ধে কবির কৈফিয়ৎও এই—

I have used more অনুপ্রাসs and যমকs than I like.—ইহাই তাঁহার সমস্ত কাব্যকে ধ্বনিসম্পদে পরিপূর্ণ করিয়া তুলিয়াছে।

কিন্তু কেবল ধ্বনিলাবণ্যে মধুসূদনের ভাষা যে পরিপূর্ণ তাহা নহে। ইহার গতিও অবাধ। পয়ার অক্ষরবৃত্ত ছন্দকে flexible করিয়া তাহার মধ্যে তিনি এমন একটা গতির আবেগ, অবাধ প্রবহমানতা আনিয়া দিয়াছিলেন, যাহা তাঁহার পূর্ববর্তী বাংলা কাব্যসাহিত্যে সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাতই ছিল।

মধুসূদন অনেক সময়েই তাঁহার কাব্যে,—বিশেষত মেঘনাদবধ কাব্যেই ব্যাকরণ-অভিধানের শাসন না মানিয়াই এমন সব শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন যেগুলি ব্যাকরণদুষ্ট শব্দ হইলেও ধ্বনিসৌন্দর্য-বিহীন হয় নাই। বরং বলিতে হয় যে, উহাতে তাঁহার কাব্যের শ্রুতিমধুরতা এবং ছন্দস্পন্দ (Verse rhythm) বাড়িয়াছে। ব্যাকরণ-অনুমোদিত 'বরুণানী' শব্দটি কবির নিকট ধ্বনিলাবণ্যময় বলিয়া মনে না হওয়ায় উহার স্থলে তিনি 'বারুণী' শব্দটি মেঘনাদবধ কাব্যে প্রয়োগ করিয়াছেন এবং কৈফিয়ৎ দিয়া বলিয়াছেন—

The name is বরুণানী, but I have turned out one syllable. To my ears the word is not half so musical as বারুণী; and I don't know why I should bother myself about Sanskrit rules.

কবির এই কৈফিয়ৎ হইতে ইহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, এইরূপ শব্দসকল তিনি যে অজ্ঞতাবশে প্রয়োগ করিতেন, তাহা নহে। বাংলা ভাষায় নূতন শক্তি ও সৌন্দর্য সঞ্চার করিবার জন্য কবি এই পন্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন।

বাংলা ভাষার শব্দসম্পদ বৃদ্ধি করার প্রেরণা কবি ইটালীর মহাকবি ভার্জিল হইতে লাভ করিয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে তিনি নিজেই বলিয়া গিয়াছেন—

The *Meghnad* is growing up to be a splendid poem. I fancy the versification more melodious and Virgilian, and the language more soft.

(বাংলা কাব্যের ক্ষেত্রে নব নব ছন্দের উদ্ভাবনেও মধুসূদনের কৃতিত্ব কম নহে।) ইটালীর মিশ্রছন্দকে তিনি বাংলায় আমদানী করিয়া গিয়াছেন। (বাংলা কাব্যে সনেটের প্রথম প্রবর্তক মধুসূদন। বাংলা কাব্যসাহিত্যের ক্ষেত্রে অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তন এই কবির কাব্য-প্রতিভার সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি। বাংলা কাব্যের আমূল সংস্কার-সাধনের বাসনার বশবর্তী হইয়াই তিনি পাশ্চাত্ত্যের নূতন নূতন ছন্দ বাংলা ভাষায় আমদানী করেন, পয়ারের বেড়ি ভাঙিয়া অমিত্রাক্ষর ছন্দ উদ্ভাবন করেন।)

মধুসূদনের পূর্ববর্তী কালের বাংলার কবিগণ পয়ার লাচাড়ী প্রভৃতি ছন্দে কাব্যসৃষ্টি করিতেন। ঐ সকল ছন্দে ভাবের স্বচ্ছন্দ স্বাধীন গতিপ্রবাহ ছিল না, চরণান্ত মিল এবং প্রতি পংক্তির নির্দিষ্ট অক্ষর সংখ্যার গণ্ডী ভাবের অবাধ প্রবাহকে ব্যাহত করিত। (ছন্দের ক্ষেত্রে পয়ারাদি ছন্দের এই বন্ধন কবির হৃদয়ভাবের স্বাধীন ও স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশের পক্ষে অন্তরায় হইয়াই ছিল।)

মধ্যযুগের শেষ কবি ভারতচন্দ্র বাংলা ছন্দের ঐ বৈচিত্র্যবিহীনতা দূর করিবার জন্য তোটক, তূণক, ভুজঙ্গপ্রয়াত প্রভৃতি বহু সংস্কৃত ছন্দ বাংলা ভাষায় আমদানী করেন। (কিন্তু তাঁহাকেও মিত্রাক্ষরের গণ্ডীর মধ্যে ভাবকে সীমাবদ্ধ রাখিতে হইয়াছিল।) বাংলা কাব্যসাহিত্যের আধুনিক যুগের প্রারম্ভে রঙ্গলালও তাঁহার কাহিনী-কাব্যসকল পয়ারেই রচনা করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু ইহাতে ভাবের স্বচ্ছন্দ স্বাধীন প্রবাহকে অবরুদ্ধ হইতে দেখিয়া,

রঙ্গলাল তাঁহার 'পদ্মিনী-উপাখ্যানে' বাংলার চতুর্দশ অক্ষরের বৃত্তিসম্পন্ন পয়ারকে আঠারো অক্ষর-সমন্বিত পয়ারে রূপান্তরিত করেন—বঙ্গসাহিত্যে আঠারো অক্ষরের পয়ারের ব্যবহার সেই প্রথম।)

ভাব অনুযায়ী পংক্তিকে প্রসারিত করার প্রয়োজনীয়তা রঙ্গলাল সর্বপ্রথম উপলব্ধি করিয়াছিলেন সত্য। কিন্তু অমিত্রাক্ষর ছন্দের উদ্ভাবন তাঁহার দ্বারা সম্ভবপর হয় নাই। অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবাহে ভাবকে যেরূপ ইচ্ছামত গতিবেগ দান করিতে পারা যায়, অষ্টাদশ অক্ষরের পয়ারে তাহা সম্ভব ছিল না।

(কিন্তু মধুসূদন দেখিয়াছিলেন যে, পাশ্চাত্ত্যের অমিত্রাক্ষর ছন্দে ভাবের প্রবাহ স্বচ্ছন্দ এবং স্বাধীন। মিলের অভাব ও যতিস্থাপনের বৈচিত্র্যবশত ঐ ছন্দে ভাব এক পংক্তি হইতে অপর একটি পংক্তিতে প্রবাহিত হইয়া চলে। ইহা লক্ষ্য করিয়া তিনি পয়ার ছন্দকে ভিত্তি করিয়া এবং মিলটনের Blank verse-কে আদর্শ করিয়া তাঁহার অমিত্রাক্ষর ছন্দ উদ্ভাবন করিলেন। পয়ারকে ভিত্তি করিয়া মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দ সৃষ্ট হইলেও এই নূতন উদ্ভাবিত ছন্দের সহিত পয়ারের বিলক্ষণ পার্থক্য রহিয়াছে। চতুর্দশাক্ষর মিত্র পয়ার ছন্দের লক্ষণ এই যে, ইহাতে শ্লোকের চরণদ্বয়ের প্রত্যেক অষ্টম অক্ষরে অল্প বিরাম থাকে, এবং দুই চরণে অন্ত্যানুপ্রাস বা মিল রাখিতে হয়। অধিকন্তু কোথাও কোথাও এক চরণের, এবং প্রায়শই দুই চরণের মধ্যেই ভাবের পরিসমাপ্তি ঘটে। কিন্তু অমিত্রাক্ষর ছন্দের সর্বত্র চতুর্দশ অক্ষরের বৃত্তি থাকিলেও, ইহাতে অন্ত্যানুপ্রাস নাই,—এখানে ভাব কোন বিরাম-যতির অনুগত হইয়া চলে না।) ভাবের অনুবর্তী যতি প্রয়োজনমত চরণের যে কোন স্থলে থাকিতে পারে। দুই হইতে বারো অক্ষরের পরে, যেখানে আবশ্যক সেখানেই ভাবানুযায়ী যতি পড়িয়া থাকে। ভাবের সমাপ্তি পংক্তির শেষে বা মধ্যে বা আদিতে, যেখানে খুশী হইতে পারে; এবং যেখানে ভাবের সমাপ্তি ঘটে সেখানেই পূর্ণচ্ছেদ পড়ে। (অমিত্রাক্ষর ছন্দে চরণান্ত ছেদ যত কম হয়, ছন্দ তত সুন্দর ও শক্তিশালী হইয়া থাকে।) চরণান্ত যতি এড়াইয়া বাক্যকে এক চরণ হইতে অপর চরণে যত গড়াইয়া প্রবাহিত করিয়া লইতে পারা যায়, ছন্দের ধ্বনি ও ভাব ততই বিচিত্র হইয়া থাকে। (অমিত্রাক্ষর ছন্দে ভাবকে যতদূর ইচ্ছা হৃদয়াবেগের সহিত সঙ্গতি রাখিয়া অগ্রসর করা যায়। অমিত্রাক্ষর ছন্দের শক্তি ও সৌন্দর্যই এইখানে।

ইহাতে মাধুর্য বা মেলডি এবং পদগতির তাল বা Rhythm সংমিশ্রিত হইয়া ভাষার ঝঙ্কার অপরূপ হইয়া উঠে। অমিত্রাক্ষর ছন্দে ভাব যতির অনুবর্তী হইয়া চলে না, বরং যতিই ভাবের অনুযায়ী চলিয়া থাকে। তাই এই ছন্দ আকাশ ও সমুদ্রের ন্যায় স্বচ্ছন্দ বিহারের ভূমি, কবির ভাবপ্রকাশের অনন্ত সম্ভাবনার ক্ষেত্র। ভাবের স্বচ্ছন্দ প্রবাহই অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রাণ।) (মধুসূদনের মেঘনাদবধ কাব্যের যতি অনির্দিষ্ট হওয়াতে ভাব কখনও দ্রুতগতিতে, কখনও বা স্খলিত গতিতে, আবার কখনও বা একেবারে স্থগিত হইয়া দাঁড়াইয়া পাঠকের মনে বিচিত্রতার বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছে।) মধুসূদন অসামান্য ধ্বনিজ্ঞান এবং তাল-লয়ের কান লইয়া এই ছন্দসৃষ্টিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন বলিয়া,(অমিত্রাক্ষর ছন্দসৃষ্টিতে তিনি যেমন কৃতিত্ব লাভ করিয়া গিয়াছেন, তেমন কৃতিত্বলাভ অন্য কোনও উত্তরকালের কবির দ্বারা সম্ভবপর হয় নাই।)

সংস্কৃত ছন্দের গাম্ভীর্য লঘুগুরু উচ্চারণের উপর ও মাত্রাধ্বনির উপর নির্ভর করে। কিন্তু বাংলা ভাষায় হ্রস্ব দীর্ঘ স্বরের উচ্চারণ প্রায় একরূপ হওয়াতে তাহা এতদিন উচ্চারণ ও মাত্রাগত ধ্বনি-তারতম্যের প্রতি যথোচিত লক্ষ্য করে নাই, কেবল চরণের মধ্য-যতি ও অন্ত্য-মিলের দিকেই দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া চলিয়াছিল। কিন্তু মধুসূদনের সচেতন কবিপ্রতিভা বঙ্গভাষার এই ধ্বনিগত শক্তির দিকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়। স্বাধীনভাবে যতিচিহ্নের যথেচ্ছ প্রয়োগ এবং হ্রস্ব দীর্ঘ উচ্চারণ যথাস্থানে বিনিয়োগ, এই দুইয়ের মধ্যেই অমিত্রাক্ষর ছন্দের শক্তি নিহিত। এইখানেই মধুসূদনের কাব্যে সংস্কৃত শব্দের ও যুক্তাক্ষরবহুল শব্দ ব্যবহারের রহস্য নিহিত আছে।

(মেঘনাদবধ কাব্যে যুক্তাক্ষরবহুল সংস্কৃত শব্দের ব্যবহার আছে।) সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করিয়া কবি তাঁহার কাব্যখানির ছন্দকে তরঙ্গায়িত করিয়া তুলিয়াছেন—প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে ছন্দের যে বৈচিত্র্যহীনতা ছিল তাহা পরিহার করিয়া তিনি ছন্দকে বৈচিত্র্যময় করিয়া তুলিয়াছেন। ছন্দকে হৃদয়-ভাবের অনুগত গতি দিয়া মধুর করিয়াছেন। মধুসূদনের পূর্ববর্তী কালের কবিদিগের ছন্দের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, কবিগণ ছন্দকে হৃদয়-ভাবের অনুগত গতি না দিয়া, কেবলমাত্র অক্ষর-সংখ্যা অথবা চরণান্ত মিলের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া ছন্দসৃষ্টি করিয়াছেন। ফলে প্রাক্-মধুসূদনীয়

যুগের ছন্দ একঘেয়ে হইয়া পড়িয়াছে। সকল প্রাচীন বাঙ্গালী কবির মধ্যেই এই দৃষ্টান্ত আছে। এইজন্য সেই সকল কবি পর্যায়ক্রমে পয়ার ও ত্রিপদীর শরণাপন্ন হইয়াছেন। (কিন্তু অমিত-প্রতিভাশালী মধুসূদন বাংলার সাহিত্য-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াই বাংলা ছন্দের অভাবটুকু অনুভব করিতে পারিলেন,) এবং পাশ্চাত্ত্যের অমিত্রছন্দের শক্তি দেখিয়া প্রথম হৃদয়ঙ্গম করিলেন যে, কাব্যের ছন্দ প্রকৃত প্রস্তাবে অক্ষরের বাহ্যিক মিলের মধ্যে নহে, উহার মূল কবির হৃদয়ে। (ছন্দ সুললিত করিতে হইলে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য সম্পাদন করিতে পারাই কবির প্রধান কৌশল। (কবির এই কুশলতা মেঘনাদবধ কাব্যের আদ্যোপান্ত সুপরিস্ফুট। বাংলা ছন্দকে ধ্বনিমাধুর্যে তরঙ্গায়িত করিয়া তুলিবার মানসেই তিনি বাছিয়া বাছিয়া মেঘনাদবধ কাব্যে সংস্কৃত শব্দের ব্যবহার করিয়াছিলেন। এইজন্যই তাঁহার কাব্যে 'ইরম্মদ' প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার হইয়াছে,—'যাদঃপতিরোধঃ যথা চলোর্মি আঘাতে' প্রভৃতি পংক্তিতে শব্দসমূহের ধ্বনি আঘাতে আঘাতে কেমন তরঙ্গায়িত হইয়া উঠিয়াছে!) মধুসূদন তাঁহার অমিত্রাক্ষর ছন্দে মিল বর্জন করিয়াছেন, কিন্তু মিলজনিত মাধুর্যের অভাবটুকু পূরণ করিবার জন্যই পংক্তিশেষের মিলের পরিবর্তে পংক্তির মধ্যে অনুপ্রাস-যমকের দ্বারা ধ্বনিলালিত্য সৃষ্টি করিয়াছেন, অথবা সংস্কৃত-মিশ্রিত বাংলাভাষার ব্যবহার করিয়াছেন।

কিন্তু মধুসূদনের প্রবর্তিত নূতন ছন্দের মাধুর্য ও শক্তি ধরিতে না পারিয়া তাঁহার সমসাময়িক কোনো কোনো সমালোচক তাঁহার ছন্দকে ব্যঙ্গ করিয়া গিয়াছেন। কেহ বা তীব্র নিন্দা করিয়াছেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রথমে এই ছন্দের অনুকূলে তাঁহার মত দিতে পারেন নাই। পরে তাঁহার মতের পরিবর্তন হইয়াছিল। তিনি তখন এই ছন্দের প্রশংসা করিয়াছিলেন।

ঢাকা জেলার পানকুণ্ড গ্রাম-নিবাসী জগদ্বন্ধু ভদ্র নামক এক ব্যক্তি ১২৭৫ সালের ১২ই আশ্বিন তারিখের বাংলা অমৃতবাজার পত্রিকায় 'ছুছুন্দরীবধ কাব্য' নামে মেঘনাদবধ কাব্যের ছন্দের একটি প্যারডি প্রকাশ করেন।

অমিত্রাক্ষর ছন্দ বিদেশী ভাষার উৎকৃষ্টতম ও সর্বাপেক্ষা কঠিন ছন্দ। সেই ছন্দকে তদানীন্তন অতি দুর্বল ও অপরিণত বাংলা কাব্যের ক্ষেত্রে প্রবর্তন করা যে কতখানি বিস্ময়কর ব্যাপার, তাহা একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝা যায়। (মধুসূদন অনন্যসাধারণ প্রতিভাবলে বিদেশী কাব্যের আত্মাকে

আত্মসাৎ করিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহার অমিত্রাক্ষর ছন্দ সঙ্গীতধ্বনিময়, জীবন্ত, গতিশীল হইয়া উঠিয়াছে।)

মধুসূদনের উদ্ভাবিত এই নূতন ছন্দ বাংলা কাব্যের রীতি প্রকৃতি, এমন কি গতিও, বদলাইয়া দিয়াছিল। যে প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া তিনি এই নূতন ছন্দ প্রবর্তন করিয়াছিলেন, সেই প্রেরণাবশেই তিনি এক নূতন ধরণের কল্পনা ও ভাবজগতের প্রতিষ্ঠাও করিয়াছিলেন। এই ছন্দ শুধু পয়ারের বেড়ি ভাঙে নাই, বাংলা সাহিত্যে নূতন ভাবজগতের সন্ধান আনিয়াছিল, ভাবের মুক্তিসাধন করিয়াছিল। পয়ারপ্লাবিত এই দেশের কবিদের মধ্যে এই ছন্দ নূতন সৃষ্টির দুঃসাহস আনিয়া দিয়াছিল,—পয়ার রচনায় অভ্যস্ত কবিদিগের মধ্যে স্বাধীনতার স্ফূর্তি সঞ্চার করিয়াছিল।

অমিত্রাক্ষর ছন্দ উদ্ভাবন করিয়া মধুসূদন কেবল কবিতার বহিরঙ্গ ভাষা ও ছন্দের সংস্কার করেন নাই; উত্তরকালের বাংলার কবিগণ মধুসূদনের সার্থক সৃষ্টি দেখিয়া বুঝিয়াছিলেন যে, ক্ষমতা থাকিলে বিদেশী কাব্যের উৎকৃষ্টতম ছন্দকে যেমন বাংলা সাহিত্যে আমদানী করা যায়, তেমনি বিদেশী কাব্যের ভাবসম্পদও বাংলা কাব্যের শ্রীসম্পাদন করিতে পারে।

(অমিত্রাক্ষর ছন্দ উদ্ভাবনের দ্বারা মধুসূদন পয়ারের অন্তর্নিহিত শক্তি যে কত বৃহৎ তাহাও সর্বপ্রথম দেখাইয়া গেলেন। অতঃপর পয়ারের শক্তি বহুল পরিমাণে বাড়িয়া গেল; অসামান্য ধ্বনিবৈচিত্র্যে বাংলা কাব্যের আদিরূপ যে পয়ার তাহা সমৃদ্ধ হইয়া উঠিল।

মধুসূদনের আদ্যোপান্ত অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত প্রথম রচনা তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য, ইহার উল্লেখ আমরা করিয়াছি। তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যের মত মেঘনাদবধ কাব্যও আদ্যোপান্ত অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত।)

মেঘনাদবধ কাব্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দ অনেকাংশে পরিণতি লাভ করিয়াছে। মেঘনাদবধ কাব্যের ছন্দে যে সঙ্গীত ও মাধুর্য রহিয়াছে তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যে সেই সঙ্গীত ও মাধুর্যের একান্ত অভাব। তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দে ভাবের প্রবাহ মধ্যে মধ্যে ব্যাহত হইয়াছে। কিন্তু মেঘনাদ-বধে তাহা হয় নাই। (মেঘনাদবধ কাব্যের ছন্দ গতিশীল—এ কাব্যের ছন্দে একটা সরলোজ্জ্বল ওজস্বী প্রবাহ আছে। তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যে সেই সরল স্বচ্ছন্দ প্রবাহ পরিলক্ষিত হয় না।)

অমিত্রাক্ষর ছন্দের যাহা কিছু সৌন্দর্য তাহার সন্ধান মধুসূদন প্রধানত মিলটন হইতে পাইয়াছিলেন। কিন্তু মিলটন ইংরাজি সাহিত্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দের উদ্ভাবন করেন নাই। তিনি ইহার চরম উৎকর্ষ সাধন করিয়া অমর হইয়া রহিয়াছেন। আর মধুসূদন বঙ্গভাষায় অমিত্রছন্দের প্রবর্তক, এবং তিনিই ইহার চরম উৎকর্ষ সাধন করিয়া গিয়াছেন।

(মধুসূদনের পরে হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র প্রভৃতি এই ছন্দে কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের কেহই এই ছন্দ ব্যবহারে মধুসূদনের মত কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই। তাঁহাদের কাব্যের ছন্দসঙ্গীত অথবা ছন্দ-প্রবাহ মেঘনাদবধ কাব্যের অমিত্রাক্ষর ছন্দ অপেক্ষা অনেকাংশে নিকৃষ্ট।) মধুসূদন ইংরাজি Blank Verse-এর অনুসরণ করিয়া ছন্দে যে অবাধ প্রবাহ সঞ্চার করিয়াছিলেন, হেমচন্দ্র সংস্কৃত ছন্দের অনুকরণ করায় সেই প্রবাহ রুদ্ধ ও ব্যাহত হইয়াছে।) হেমচন্দ্রের অমিত্রাক্ষর ছন্দ মিলহীন পয়ার, উহাতে অমিত্রাক্ষর ছন্দের যে অনুপ্রাস ও ছন্দস্পন্দ তাহা নাই। তাঁহার ছন্দ কেবল উন্মাদনাপূর্ণ, সরল গদ্যেরই রূপান্তর মাত্র। অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রকৃতি ও মাধুর্য মধুসূদন যতখানি উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন, হেমচন্দ্র মধুসূদনের পরে কাব্য রচনা করিতে আরম্ভ করিয়াও অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রকৃতি ও মাধুর্য ঠিক ততখানি উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। নবীনচন্দ্রের ছন্দ মাঝে মাঝে সঙ্গীতধ্বনিময় বটে। কিন্তু সর্বত্র নহে। তাই বলিতে হয় যে, অমিত্রাক্ষর ছন্দের স্রষ্টা এবং চরম উৎকর্ষসাধক হিসাবে মধুসূদন বাংলা কাব্যসাহিত্যে আজিও এককভাবে দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহার যশ অপর কোনও পরবর্তী কবি পরিম্লান করিতে পারেন নাই।

একমাত্র অমিত্রাক্ষর ছন্দকে আশ্রয় করিয়া মধুসূদন তাঁহার মেঘনাদবধ কাব্যে বিভিন্ন প্রকার ভাব প্রকাশ করিয়া যে অসামান্য ক্ষমতার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, বঙ্গসাহিত্যে সেইরূপ দৃষ্টান্ত আর লক্ষিত হয় না। (গীতিকবিতা রচনা করিবার জন্য বহু ছন্দের প্রয়োজন। গীতিকবি তাঁহার অন্তরস্থিত ভাব প্রকাশ করিবার নিমিত্ত ভাবের অনুরূপ বাহন বিভিন্ন ছন্দের ব্যবহার করিয়া থাকেন। গীতিকবির প্রত্যেক কবিতার রূপ স্বতন্ত্র, ছন্দ স্বতন্ত্র।) প্রত্যেক সন্ধ্যা গীতিকবির নিকটে নূতন রূপ লইয়া আবির্ভূত হয়। প্রতিটি সন্ধ্যা গীতিকবির কবিতায় বিভিন্ন ছন্দোবৈচিত্র্যে প্রকাশ পাইয়া থাকে।

Blank Verse আর গীতিকবিতার ছন্দে পার্থক্য এইখানে। বিভিন্ন রং রূপ ও ভাব প্রকাশ করিতে হইলে গীতিকবির নিকট বিভিন্ন ছন্দের প্রয়োজন হইয়া পড়ে,—কিন্তু গুরুগম্ভীর বীরত্বপূর্ণ ভাব হইতে আরম্ভ করিয়া, মৃদুমধুর বেণুবীণানিক্কণ পর্যন্ত সকল প্রকার ভাবই এক অমিত্রাক্ষর ছন্দের আধারে অভিব্যক্ত হইতে পারে। তাই দেখি, মেঘনাদবধ কাব্যের ছন্দের ভিতর দিয়া বাঁশীর মৃদুমধুর গুঞ্জরণ হইতে আরম্ভ করিয়া ভেরীর সুগম্ভীর রব পর্যন্ত সবই প্রকাশ পাইয়াছে—একই প্রবাহে ও আধারে বিভিন্ন রং রূপ ও ছায়া প্রতিভাত হইয়াছে।)

মিলটন সম্বন্ধে জনৈক ইংরাজ সমালোচক বলিয়াছেন—His style is bold and at times sweetly lyric,—একথা মিলটনের কাব্যের অনুরাগী ও মিলটনের কাব্যমন্ত্রে দীক্ষিত মধুসূদন সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। এক অমিত্রাক্ষর ছন্দের সাহায্যে বীর ও করুণ রস পরিবেশন করিতে সক্ষম হইবেন বলিয়াই বোধ হয় মধুসূদন এই ছন্দকে আশ্রয় করিয়া তাঁহার মেঘনাদবধ কাব্যখানি রচনা করিয়াছিলেন।) মেঘনাদবধ কাব্যে এপিক ও লিরিক Blank Verse দুইয়েরই প্রয়োগ আছে। এ কাব্যের অমিত্রাক্ষর ছন্দ কোথাও বাঁশীর ললিত রাগিণী শুনাইয়াছে, কোথাও গুরুগম্ভীর ধ্বনিতরঙ্গ শুনাইয়াছে। যে ছন্দে তিনি সীতার মত একটি লিরিক প্রতিমা গঠন করিয়াছেন, রাবণের আক্ষেপোক্তি, রামের করুণ বিলাপ প্রকাশ করিয়াছেন,—উহারই সহায়তায় প্রমীলার বীরাঙ্গনা-মূর্তি তিনি গঠন করিয়াছেন, মেঘনাদের বীরত্বদৃপ্ত মূর্তি আঁকিয়াছেন,—রাবণ মেঘনাদ লক্ষ্মণ প্রভৃতির বীরত্ব, চিত্রাঙ্গদার তেজস্বিতা ঐ ছন্দকেই আশ্রয় করিয়া সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।)

ব্রজাঙ্গনা কাব্য

গীতিকাব্যের প্রতি মধুসূদনের একটা আকর্ষণ ছিল। তাঁহার কবিমানসে রোমান্টিক কাব্যাদর্শও প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। এ সম্বন্ধে তিনি রাজনারায়ণ বসু মহাশয়কে লিখিয়াছিলেন—

"I must suppose that I must bid adieu to Heroic Poetry after *Meghnad*. A fresh attempt would be something like a repetition. But there is the wide field of Romantic and Lyric Poetry before me, and I think, I have a tendency in the Lyrical way.

লিরিকের প্রতি কবির যে একটা প্রবল আসক্তি ছিল, মেঘনাদবধ কাব্যও তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। ঐ কাব্যের অনেক স্থলেই লিরিক উচ্ছ্বাস। মেঘনাদবধ কাব্য রচনার পরে তিনি আর বীররসাত্মক কাব্য রচনা করিবেন না বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। এই সঙ্কল্পবশে তিনি ব্রজাঙ্গনা কাব্য রচনা করিয়াছিলেন।

(ব্রজাঙ্গনা কাব্য গ্রীক ওডের সমশ্রেণীর। ইহার রূপ (Form) এবং গঠনরীতিতে (Technique) কবি গ্রীক ওড্-রীতিকেই আদর্শ করিয়াছেন। কোনও একটি বিশেষ ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া নানা ছন্দে বা একেবারে স্বাধীন ছন্দে (*Vers Libers*) সম্বোধন বা হৃদয়ের উচ্ছ্বসিত অভিব্যক্তিই ওডের বিশেষত্ব। এই কাব্যে কবি সেই বিশেষত্বটুকু বজায় রাখিয়াছেন। কবি এখানে রাধাভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া তাঁহার নিজেরই অনুভূতি রাধার বেনামী অভিব্যক্ত করিয়াছেন—রাধার দৃষ্টিতে তিনি বিশ্বপ্রকৃতিকে দর্শন করিয়াছেন।)

ব্রজাঙ্গনা গীতিকাব্য। ইহা Love Lyric—রাধাবিরহ ব্রজাঙ্গনা কাব্যের বিষয়বস্তু। (শ্রীকৃষ্ণের অদর্শনে বিরহিণী রাধিকার কাতর ও করুণ বিলাপ এই কাব্যের মধ্যে অভিব্যক্ত হইয়াছে। রাধার সম্মুখ দিয়া যমুনার নীলজল কলধ্বনি করিয়া বহিয়া যাইতেছে, কেশরকান্তি কদম্বফুল ফুটিয়া রহিয়াছে,

মাধবীলতা তমালতরুকে আলিঙ্গন করিয়া আছে, তরুশাখায় শিখিনী কেকারব করিয়া উল্লাসে নৃত্য করিতেছে, বিকশিত নলিনীর পরাগরেণু অঙ্গে মাখিয়া মধুমত্ত ভ্রমর গুঞ্জন করিতেছে, ঊষাদেবী আবির্ভূতা হইয়া সকল অন্ধকার দূর করিতেছেন, মলয়-মারুত মৃদু-মধুর সৌরভ বিকিরণ করিয়া প্রবাহিত হইতেছে—বৃন্দাবনে সকলই আছে। কিন্তু একমাত্র কৃষ্ণের অভাব,—আর সেই অভাববশত রাধার নয়নে সকলই আঁধার, সকলই শূন্য। মুরলী-ধ্বনি শুনিয়া রাধিকার ব্যাকুলতা বাড়িয়াছে। জলধর দেখিয়া—

নাচিছে শিখিনী সুখে কেকা-রব করি',
হেরি' ব্রজ-কুঞ্জবনে, রাধা, রাধা-প্রাণধনে
নাচিত যেমতি যত গোকুল সুন্দরী।
উড়িতেছে চাতকিনী, শূন্য পথে বিহারিণী
জয়ধ্বনি করি' ধনী—জলদ কিঙ্করী।

কিন্তু রাধিকার নিকট ঐ সকল দৃশ্য পীড়াদায়ক। তাই তিনি আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন—

হায় রে, কোথায় আজি শ্যাম-জলধর।

গোধূলি-আগমনে বিরহিণী রাধিকা বলিয়াছেন—

কোথা, রে, রাখাল-চূড়ামণি!
গোকুলের গাভীকুল, দেখ, সখি, শোকাকুল,
না শুনে সে মুরলীর ধ্বনি!
ধীরে ধীরে গোষ্ঠে সবে পশিছে নীরব,—
আইল গোধূলি, কোথা রহিল মাধব!

বসন্ত-সমাগমে রাধিকার মনে হইয়াছে যে, তাঁহার প্রিয়তম নিশ্চয় ফিরিয়াছেন, নহিলে বনে বনে কুসুম মুকুলিত হইবে কেন—কেন কোকিলের কুহুধ্বনি, ভ্রমরের গুঞ্জন, মলয়-সমীরে তরঙ্গায়িত যমুনার নৃত্য হইবে? উন্মাদিনী রাধিকা ভাবিয়াছেন যে, বিশ্বপ্রকৃতির যখন এত সাজ, তখন 'শ্যামরাজ' আসিয়াছেন নিশ্চয়। বিরহিণী রাধিকা প্রিয়মিলনের আশায় আশান্বিতা হইয়া বলিতেছেন—

সখি রে,—
বন অতি রমিত হইল ফুল-ফুটনে!
পিককুল কলকল চঞ্চল অলিদল,

উছলে সুরবে জল,—চল্, লো, বনে!
চল্, লো, জুড়াব আঁখি, দেখি' ব্রজরমণে!

সখি রে,—

উদয়-অচলে ঊষা, দেখ, আসি' হাসিছে!
এ বিরহ-বিভাবরী কাটানু ধৈরজ ধরি'
এবে, লো, রব কি করি'?—প্রাণ কাঁদিছে!
চল্, লো, নিকুঞ্জে, যথা কুঞ্জ-মণি নাচিছে!

সখি রে,—

পূজে ঋতুরাজে আজি ফুলজালে ধরণী!
ধূপ-রূপে পরিমল, আমোদিছে বনস্থল,
বিহঙ্গমকুল-কল, মঙ্গলধ্বনি!
চল্, লো, নিকুঞ্জে, পূজি শ্যামরাজে স্বজনি!

সখি রে,—

পাদ্য-রূপে অশ্রুধারা দিয়া ধোব চরণে!
দুই কর-কোকনদে, পূজিব রাজীব-পদে,
শ্বাসে ধূপ, লো প্রমদে ভাবিয়া মনে!
কঙ্কণ-কিঙ্কিণী-ধ্বনি বাজিবে, লো সঘনে!

রাধিকার কোমল হৃদয়ের আর্তি এবং আগ্রহকে কবি এখানে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন।

ব্রজাঙ্গনায় প্রকৃতির প্রতি কখনও বা রাধার অভিমান প্রকাশ পাইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন—

এই যে কুসুম, শিরোপরে পরেছি যতনে,
মম শ্যামচূড়া-রূপ ধরে এ ফুল-রতনে!
বসুধা নিজ কুন্তলে, পরেছিল কুতূহলে
এ উজ্জ্বল মণি,
রাগে তারে গালি দিয়া, লয়েছি আমি কাড়িয়া,
মোর কৃষ্ণচূড়া কেন, পরিবে ধরণী?

কখনও রাধিকা ময়ূরী ও সারিকার দুঃখে সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন—

তরুশাখা উপরে, শিখিনি !
কেন, লো, বসিয়া তুই বিরস বদনে ?
না হেরিয়া শ্যামচাঁদে' তোরো কি পরাণ কাঁদে ?—
তুইও কি দুঃখিনী ?
আহা ! কে না ভালবাসে রাধিকারমণে ?

পিঞ্জরাবদ্ধ সারিকার মত অবস্থা রাধিকার। তাই তিনি বলিয়াছেন—

কার না জুড়ায় আঁখি শশী, বিহঙ্গিনি ?
ওই যে পাখীটি, সখি, দেখিছ পিঞ্জরে, রে
সতত চঞ্চল,—
কভু কাঁদে, কভু গায়, যেন পাগলিনী-প্রায়,
জলে যথা জ্যোতি-বিম্ব—তেমতি তরল !
কি ভাবে ভাবিনী যদি বুঝিতে, স্বজনি,
পিঞ্জর ভাঙ্গিয়া ওরে ছাড়িতে অমনি !

ব্রজাঙ্গনায় বিরহ-বিধুরা রাধিকার বিহ্বল অবস্থা নানাভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। বংশী-ধ্বনি শুনিয়া তিনি কখনও বা বিরহতপ্ত, কখনও বিরহবশে তিনি অভিমানিনী, কখনও বা তিনি বিরহ অবসানের জন্য কাতর প্রার্থনা জানাইয়াছেন পৃথিবীর নিকট, অথবা গিরি-গোবর্ধনের নিকট ; কখনও আশা পোষণ করিয়াছেন যে শ্যাম ফিরিয়া আসিয়াছেন।

এই কাব্যে রাধিকা তাঁহার নিজের আনন্দ-বেদনা বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে প্রতিফলিত দেখিতে পাইয়াছেন। তিনি নিজে বিরহিণী, তাই যমুনা-তটে গিয়া যমুনার বিরহই তাঁহার চক্ষে প্রতিভাত হইয়াছে।

মৃদু কলরবে তুমি, ওহে শৈবলিনি !
কি কহিছ, ভাল ক'রে কহ না আমারে।
সাগর-বিরহে যদি, প্রাণ তব কাঁদে, নদি
তোমার মনের কথা কহ রাধিকারে—
তুমি কি জান না, ধনি, সেও বিরহিণী !

এসো, সখি ! তুমি আমি বসি এ বিরলে
দুজনের মনোজ্বালা জুড়াই দুজনে,

তব কূলে, কল্লোলিনি ! ভ্রমি আমি একাকিনী,
অনাথা অতিথি আমি তোমার সদনে—
ভিতেছে বসন মোর নয়নের জলে !

মধুসূদনের আবির্ভাবের পূর্ব পযন্ত বাংলা কাব্যসাহিত্যে প্রকৃতি ও মানব স্বতন্ত্র অস্তিত্ব লইয়া বিরাজিত ছিল। প্রকৃতির প্রাণচেতনার আভাস, বা প্রকৃতির সহিত একটা একাত্মতাবোধ প্রাক্‌মধুসূদনীয় যুগের কবিকল্পনায় ধরা পড়ে নাই। কিন্তু মধুসূদন তাঁহার এই কাব্যে মানবপ্রকৃতি ও বিশ্বপ্রকৃতিকে এক অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া দিয়াছেন। কবি এখানে কেবল চোখের দৃষ্টিতে প্রকৃতির বাহিরের রূপটি দেখেন নাই,—মনের দৃষ্টিতে, কল্পনার দৃষ্টিতে প্রকৃতিকে দেখিয়াছেন। সেইজন্য প্রকৃতির অন্তঃপ্রকৃতির পরিচয়টিও পাইয়াছেন। মানুষের চেতনা ও বেদনার সহিত প্রকৃতির সম্বন্ধ এখানে ঘনিষ্ঠ। মৃন্ময়ী প্রকৃতি এখানে চিন্ময়ী মমতাময়ী মূর্তিতে প্রতিভাত হইয়াছে এবং রাধা প্রকৃতির মধ্যে তাঁহার দুঃখবেদনার প্রতি সহানুভূতি সমবেদনার আভাস পাইয়া সান্ত্বনা খুঁজিয়া পাইয়াছেন,—প্রকৃতির কাছে আপন মর্মবেদনাকে প্রকাশ করিয়া আপন মনের বেদনাভার তিনি লাঘব করিয়াছেন। ইহাতে রাধার অন্তর্বেদনার গভীরতা উপলব্ধির সহায়তাই হইয়াছে।

ব্রজাঙ্গনার বিরহিণী-রাধিকার ব্যাকুলতা আর বৈষ্ণব কাব্যের বিরহ-বিধুরা আরাধিকা-শিরোমণি শ্রীরাধিকার দিব্যোন্মাদ এক জিনিস নহে। রাধাচিত্র অঙ্কনে মধুকবি কোনরূপ আধ্যাত্মিক ভাবে অনুপ্রাণিত হন নাই—শাস্ত্রশাসন মানিয়া কাব্যরচনা করা মধুসূদনের প্রকৃতিবিরুদ্ধও ছিল। ব্রজাঙ্গনায় রাধা প্রেমময়ী মানবী। তাঁহার বিরহাবস্থা বর্ণনা করাই কবির লক্ষ্য। এই জিনিসটি উপলব্ধি করিলে তবে আমরা ব্রজাঙ্গনা কাব্যের রস-গ্রহণে সমর্থ হইব। মধুসূদন বৈষ্ণব কবিদের মত সাধক-কবি ছিলেন না, সেইজন্য তাঁহার ব্রজাঙ্গনায় বৈষ্ণবকাব্যের আধ্যাত্মিকতার অভাব। মধুসূদন রাধাবিরহ বর্ণনা করিয়াছেন ভাবের আবেগে। এই কারণে আধ্যাত্মিকতা না থাকিলেও, ব্রজাঙ্গনায় কবিত্ব আছে। আর আছে বিরহিণী রমণীর অন্তররহস্য-বিশ্লেষণ। এই সকল কারণে শ্রীযুক্ত দীননাথ সান্যাল মহাশয় বলিয়াছেন—

শুধু কাব্য-প্রতিভা-বলে কাব্যাংশে সাধক-কবির কতখানি সমকক্ষ হওয়া যায়, এই ব্রজাঙ্গনা কাব্যখানি তাহার চমৎকার নিদর্শন।

বৈষ্ণব কবিতায় যেমন বিচিত্র ভাবের অনুভূতি অভিব্যক্ত হইয়াছে—সেখানে যেমন রাধা-প্রেমের বিবিধ অবস্থা,—পূর্বরাগ, মান, বিরহ, মিলন প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে, ব্রজাঙ্গনায় তাহা নাই। ব্রজাঙ্গনার কবির রাধা ভক্ত বৈষ্ণবের পরমাপ্রকৃতি রাধা নহেন। ইনি বিরহ-কাতরা রমণী মাত্র। ব্রজাঙ্গনার রাধায় চিরন্তনকালের বিরহিণী রমণীর ব্যাকুলা মূর্তিটিই দেখিতে পাইব। এই কাব্যে বিষাদময়ী রমণীর প্রতি কবির সহানুভূতি প্রকাশ পাইয়াছে।

ব্রজাঙ্গনা কাব্যের রাধার চিত্র জয়দেব ও বিদ্যাপতি হইতে অনুকৃত হইয়াছে। কিন্তু মধুসূদন এমন একজন কবি ছিলেন যাঁহার নিপুণ তুলিকা-স্পর্শে অনুকৃতিও নূতন সৌন্দর্যে উদ্‌ভাসিত হইয়া উঠিত। এই কাব্য রচনাতেও মধুসূদন সেইরূপ প্রতিভার পরিচয় দান করিয়াছেন। এ কাব্যের রাধিকায় জয়দেব বিদ্যাপতির ভোগলালসার আভাস নাই। রাধিকার চিত্রাঙ্কনে কবি তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিয়াছেন। রাধিকার অন্তর্জগতের সৌন্দর্য ব্রজাঙ্গনা কাব্যের সর্বত্রই অতি উজ্জ্বল বর্ণে অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে।

এই কাব্যের ভাষা ও ছন্দের মাধুর্য সম্পাদনে কবি বৈষ্ণবকাব্যের অনুসরণ করেন নাই। ইহার ভাষা ও ছন্দ বঙ্গসাহিত্যে এক নূতন সম্পদ। ব্রজাঙ্গনায় কবি পয়ার ও লাচাড়ীর সংমিশ্রণে নূতন এক মিশ্র-ছন্দ ব্যবহার করিয়াছেন। প্রসার-ধর্মী পয়ার ও নৃত্যধর্মী লাচাড়ী ছন্দের সংমিশ্রণে যে কত অগণিত মিশ্র-ছন্দের উৎপত্তি হইতে পারে, ইহা মধুসূদনের পূর্বে আর কোনও কবি ধারণা করিতে পারেন নাই। ব্রজাঙ্গনার ছন্দ ইটালীর মিশ্রছন্দের আদর্শে অনুপ্রাণিত নূতন সৃষ্টি। ক্রমাগত পয়ার অথবা লাচাড়ী ছন্দ ব্যবহার করিলে কাব্য বৈচিত্র্যহীন হইয়া পড়ে—ছন্দে ধ্বনিবৈচিত্র্য অবিচ্ছিন্ন রাখিবার জন্য মধুসূদন তাঁহার এই কাব্যে মিশ্র ছন্দ প্রবর্তন করেন। এ সম্বন্ধে তিনি যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহা এখানে উল্লেখযোগ্য—

"I have made up my mind to write (*Deo Volente !*) three short poems in Blank-Verse, and then do something in

rhyme ; don't fancy I am going to inflict পয়ার and ত্রিপদী on you. No ! I mean to construct a stanza like the Italian *Ottava Rima* and write a romantic tale in it."

মেঘনাদবধ কাব্যে কবি ছন্দকে তরঙ্গায়িত করিয়া তুলিবার জন্য মধ্যে মধ্যে দুরূহ শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। কিন্তু গীতিকাব্যের উপযোগী ভাষা ব্যবহারেও মধুসূদনের অসাধারণ দক্ষতা ছিল। ব্রজাঙ্গনায় তাহার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। এ কাব্যে কবি গীতিকাব্যের উপযোগী অতি সহজ সরল শব্দ ব্যবহার করিয়া ইহার অন্ত্যোপান্ত ছন্দসৌষ্ঠব ও ছন্দমাধুর্য বজায় রাখিয়াছেন।

ব্রজাঙ্গনা কাব্যে কবির অনুপ্রাসে কোনও কষ্টকল্পনা নাই। যেমন—

কেন এত ফুল তুলিলি স্বজনি—
ভরিয়া ডালা ?
মেঘাবৃত হলে পরে কি রজনী
তারার মালা ?
আর কি যতনে, কুসুম-রতনে
ব্রজের বালা ?
আর কি পরিবে কভু ফুল-হার
ব্রজ-কামিনী ?
কেন, লো, হরিলি ভূষণ লতার—
বনশোভিনী ?
অলি বঁধু তার, কে আছে রাধার—
হতভাগিনী !

ইহার অনুপ্রাস ইংরাজ কবি কীট্সের কাব্যের অনুপ্রাসের মতই সুমধুর।

মধুসূদন কেবল অমিত্রাক্ষর ছন্দের স্রষ্টা নহেন, মিত্রছন্দে কাব্যরচনা করিয়া তিনি উহাকেও অপূর্ব সৌন্দর্য দান করিয়াছিলেন। তাহার উৎকৃষ্ট উদাহরণ ব্রজাঙ্গনা কাব্য। মিত্রাক্ষর ছন্দকেও মধুসূদন নূতন ধ্বনিমাধুর্য দান করিয়া গিয়াছেন।

ব্রজাঙ্গনা কাব্যের জন্য মধুসূদন 'বিহার' নামক একটি সর্গ লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তিনি তাহা শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই।

বীরাঙ্গনা কাব্য

বীরাঙ্গনা অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত পত্রকাব্য। এ কাব্যের গঠনরীতি অভিনব, এ রীতি বঙ্গসাহিত্যে ইতিপূর্বে ছিল না। এই কাব্যে পুরাণান্তর্গত বিভিন্ন নায়িকা তাঁহাদের পতি বা বাঞ্ছিতের উদ্দেশ্যে পত্র প্রেরণ করিতেছেন। পৌরাণিক নায়িকাগণের চিত্তোদ্‌ঘাটনের জন্য,—উহাদের অন্তরের রহস্যকে অভিব্যক্তি দানের জন্য, বীরাঙ্গনার পত্রাবলী রচিত। পত্রগুলির মধ্য দিয়া বিভিন্ন পুরাণান্তর্গত নায়িকা তাঁহাদের হৃদয়ের আশা-আকাঙ্ক্ষা, কামনা-বাসনা-বেদনা অথবা উদ্বেগ-ব্যাকুলতা প্রকাশ করিয়াছেন। সুপ্রসিদ্ধ রোমক কবি ওভিদের (Ovid) বীরপত্রাবলীর আদর্শে বীরাঙ্গনার পত্রগুলি রচিত। এই কাব্যখানি রচনাকালে কবি একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন। পত্রখানি এইরূপ—**Within the last few weeks I have been scribbling the thing to be called বীরাঙ্গনা, i. e. Heroic Epistles from the most noted Puranic women to their lovers or lords.**

বহিরঙ্গ গঠনের দিক দিয়া এ কাব্য ওভিদের দ্বারা প্রভাবান্বিত সৃষ্টি হইলেও, এ কাব্যের ভাব ভাষা কবিত্ব প্রকাশভঙ্গি এ সবই কবির নিজস্ব—বর্ণনীয় বিষয় বা কাহিনী ভারতীয়। ওভিদের কাব্যের নায়িকাগণ গ্রীস ও রোমের পুরাণপ্রসিদ্ধা নায়িকা। কিন্তু মধুসূদন তাঁহার কাব্যের নায়িকাগণকে গ্রহণ করিয়াছেন রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবত হইতে। তারা, শূর্পনখা, দ্রৌপদী, ভানুমতী, রুক্মিণী, উর্বশী প্রভৃতির পত্রে ভারতীয় পুরাণান্তর্গত ঘটনা ও চরিত্রের সুস্পষ্ট প্রতিচ্ছবিই পাওয়া গিয়াছে।

বীরাঙ্গনায় ১১খানি পত্রিকা আছে। তন্মধ্যে এক জনার পত্র ছাড়া অন্য সকল পত্রিকাই প্রণয়-পত্রিকা। জনার পত্রিকা বীররসাত্মক। এ কাব্যের পত্রাবলীকে চারিটি শ্রেণীতে ভাগ করিয়া দেখা যাইতে পারে। ১। প্রেম-পত্র, ২। প্রত্যাখ্যান-পত্র, ৩। স্মরণার্থ পত্র, ৪। অনুযোগ-পত্র।—প্রেম-পত্রিকাগুলিকে আবার চারিটি উপবিভাগে ভাগ করা যাইতে পারে; যথা—ক। তারার পত্র, খ। শূর্পনখার পত্র, গ। উর্বশীর পত্র, ঘ। রুক্মিণীর পত্র।

—তারা সোমপত্নী, তিনি সধবা। শূর্পনখা স্বামিহীনা। উর্বশী বারবনিতা। রুক্মিণী কুমারী। ইহারা নারীজীবনের সম্ভাব্য চারি অবস্থার type। এই চারি-জনের পত্রে প্রত্যেকেরই চরিত্র ও প্রেম-নিবেদনের পার্থক্য সুন্দরভাবে দেখানো হইয়াছে।

১। **প্রেম-পত্রিকা**ঃ উর্বশীর পত্রঃ উর্বশী স্বর্গের অপ্সরাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠা—সে অনন্তযৌবনা রূপোপজীবিনী। সখী চিত্রলেখাকে সঙ্গে লইয়া কুবের-ভবন হইতে ফিরিবার সময়ে কেশী নামক দৈত্য তাহাকে হরণ করিয়া লইয়া যায়। তখন পুরুরবা দৈত্যহস্ত হইতে সখীসহ উর্বশীকে উদ্ধার করেন। ইহাতে উর্বশী রাজা পুরুরবার প্রতি অনুরক্তা হয়।

অতঃপর একদিবস রাত্রিকালে স্বর্গলোকে ইন্দ্রসভায় নাটকের অভিনয় হইতেছিল। সেদিন সৌন্দর্যলোকের সেই নন্দনকাননে অবস্থান করা সত্ত্বেও উর্বশীর মন মর্ত্যের পুরুরবার সহিত মিলিত হইবার জন্য চঞ্চল হইয়া উঠিল এবং নৃত্যকালে অন্যমনস্কতায় তাহার তালভঙ্গ হইল। ফলে অভিশপ্তা হইয়া নর্তকী উর্বশী স্বর্গভ্রষ্টা হয়।

পুরাণের এই কাহিনীটিকে অবলম্বন করিয়া কবিশ্রেষ্ঠ কালিদাস তাঁহার বিক্রমোর্বশী নাটকখানি রচনা করেন। কালিদাসের নাটকের সেই আখ্যায়িকা মধুসূদনকে তাঁহার বীরাঙ্গনা কাব্যের উর্বশী পত্রিকা রচনার সূত্র ধরাইয়া দিয়াছিল। উর্বশী পত্রিকায় রূপোপজীবিনী উর্বশীর প্রণয়নিবেদন ব্যক্ত হইয়াছে।

উর্বশী তাহার পত্রিকারম্ভে তাহার স্বর্গভ্রষ্ট হওয়ার কাহিনী প্রথমে বিবৃত করিয়াছে। সে অকপটে বলিয়াছে যে, পুরুরবার প্রতি প্রগাঢ় আসক্তিবশত অভিনয়কালে সে আত্মবিস্মৃত হইয়া বলিয়া ফেলিয়াছিল যে, রাজা পুরুরবার প্রতি সে আসক্ত। ফলে সে অভিশপ্তা হইয়া স্বর্গভ্রষ্টা। কিন্তু তাহাতে সে ক্ষুব্ধা নহে। পুরুরবার প্রেম লাভ করিলে সে নিজেকে ধন্যা মনে করিবে। সে সমস্ত লজ্জা সঙ্কোচ ত্যাগ করিয়া বলিয়াছে যে, পুরুরবার প্রতি তাহার আকর্ষণ দুর্বার,—তাহার প্রেম—

যথা বহে প্রবাহিণী বেগে সিন্ধুনীরে
অবিরাম; যথা চাহে রবিচ্ছবি পানে
স্থির আঁখি সূর্যমুখী!

সুখের প্রতি সুযমুখীর প্রেমে যে একনিষ্ঠতা, পুরুরবার প্রতি উবরশী প্রেমেও সেইরূপ একনিষ্ঠতা।

পুরুরবার প্রতি অনুরক্তা উর্বশীর প্রেম যদি রাজা প্রত্যাখ্যান করেন, তবে উর্বশী সকল সুখে জলাঞ্জলি দিয়া তপস্যায় প্রবৃত্ত হইবে।

যদি ঘৃণা কর, দেব, কহ শীঘ্র, শুনি !
অমরা অপ্সরা আমি, নারিব ত্যজিতে
কলেবর ; ঘোর বনে পশি' আরম্ভিব
তপঃ তপস্বিনী বেশে, দিয়া জলাঞ্জলি
সংসারের সুখে, শূর !

আর পুরুরবা যদি উর্বশীর প্রতি সদয় হন, তাহা হইলে সে পরমানন্দে তাঁহার সহিত মিলিত হইবে।—

দেহ আজ্ঞা, নরেশ্বর, সুরপুর ছাড়ি'
পড়ি ও রাজীব পদে, পড়ে বারিধারা
যথা, ছাড়ি মেঘাশ্রয়, সাগর-আশ্রয়ে,—
নীলাম্বুরাশির সহিত মিশিতে আমোদে ;

এই পত্রিকায় কবি দেখাইয়াছেন যে, উর্বশী বারাঙ্গনা হইয়াও প্রেমিকা। উর্বশীর প্রেম রূপজ মোহজাত নহে, উহা বীরত্বানুরাগ ও কৃতজ্ঞতায় উজ্জ্বল। ভোগে ও ত্যাগে এ প্রেম রুদ্রের উপাসক। এ প্রেম স্বর্গ হইতে বিদায় লইয়া মর্ত্যভূমির দুঃখবেদনার কণ্টকক্ষেত্রে সার্থকতা লাভ করিতে চাহিয়াছে।

সোমের প্রতি তারা : পুরাণের তারা স্বামিশিষ্য সোমদেবের অসামান্য রূপলাবণ্য দেখিয়া তাঁহার প্রতি আসক্তিপরায়ণা হইয়া পত্ররচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু মধুসূদনের তারার চরিত্রে এমন একটি দ্বন্দ্ব রহিয়াছে, যাহার সাক্ষাৎকার আমরা পুরাণান্তর্গত তারার মধ্যে লক্ষ্য করি নাই। এই দ্বন্দ্বেই তারার সৌন্দর্য। অসংযত প্রবৃত্তির অধীনা হইয়াও তিনি নিজের পাপের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়াছেন এবং সেজন্য অনুতাপ করিয়া বলিয়াছেন—

—হা ধিক, কি পাপে
হায় রে কি পাপে বিধি, এ তাপ লিখিল
এ ভালে ? জনম মম মহাঋষিকুলে,
তবু চণ্ডালিনী আমি !

একদিকে প্রবৃত্তি, অন্যদিকে সমাজসংস্কারের দ্বন্দ্বে পড়িয়া নারীর জীবনে যে কি অন্তর্বেদনার সৃষ্টি হয় তাহা জীবনশিল্পী মধুসূদনের দৃষ্টি এড়াইয়া যায় নাই। জীবনের সহিত কবির সাক্ষাৎ পরিচয়ের ফলশ্রুতি এই তারার পত্রিকাখানি। জীবনধর্মী মধুসূদন তারার মনোবেদনা সহানুভূতির সহিত অনুভব করিয়াছেন। স্বামী শিষ্যের সহিত শাস্ত্রচর্চা করিয়া দিনাতিপাত করেন। কিন্তু আশ্রমে যে কামনা-বাসনাময়ী একটি নারী রহিয়াছেন, সেকথা দেবগুরু বৃহস্পতি বিস্মৃত হইয়াছিলেন। নবজাগ্রত যৌবন যে বল্কলের শাসন মানে না, ঋষিকল্পনায় তাহা জাগে নাই। সেইজন্য তারা সোমের প্রতি অনুরক্তা। জীবনের এই ধর্মানুসারেই বঙ্কিমচন্দ্রের শৈবলিনী চন্দ্রশেখরকে স্বামীরূপে পাইয়াও প্রতাপকে ভুলিতে পারে নাই। বীরাঙ্গনা কাব্যে কবি নারীহৃদয়ের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কামনা ও বেদনাকে তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টি লইয়া দেখিয়াছেন বলিয়াই এ কাব্যের চরিত্রগুলি পুরাণান্তর্গত চরিত্রসকলের ঠিক অনুকৃতি হয় নাই। চরিত্রগুলি বাস্তবের রসপ্রেরণা লাভ করিয়া সম্পূর্ণ নূতন সৃষ্টি হইয়া উঠিয়াছে।

রুক্মিণী পত্রিকা : ভাগবতে রুক্মিণী-কর্তৃক দ্বারকানাথকে পূর্বরাগাত্মক পত্র-প্রেরণের কথা আছে। রুক্মিণীর যৌবনসমাগমে তাঁহার মাতা শিশুপালের সহিত ইঁহার বিবাহ দিতে প্রয়াসী হন। ইহাতে কুলবালা হইয়াও কালরূপী শিশুপালের কবল হইতে মুক্ত করিবার জন্য তিনি শ্রীকৃষ্ণকে পত্র দিয়াছেন। পত্রের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি রুক্মিণী তাঁহার অন্তরের অনুরাগ ব্যক্ত করিয়াছেন।

রুক্মিণীর পত্রের উৎস ভাগবত হইলেও, মধুসূদনের পত্রখানির মধ্যে নূতনত্ব রহিয়াছে। ভাগবতের রুক্মিণী ক্ষত্রিয়া নারী, তাঁহার মধ্যে দীপ্ত তেজের প্রকাশ। কিন্তু মধুসূদনের রুক্মিণীতে রাধাভাব, নির্বিকার আত্মসমর্পণের প্রসঙ্গ। তাঁহার মধ্যে ক্ষাত্র-তেজ নাই, তিনি 'অবলা-কুলের বালা'। ভাগবত-বর্ণিত ক্ষত্রিয়া রুক্মিণীকে কবি নিষ্ঠাবান্ বৈষ্ণব ভক্তের দৃষ্টিতে দেখিয়াছেন। রুক্মিণীর চিত্র বিরহিণী রাধার প্রতিচ্ছবি। বৈষ্ণব কাব্যের রাধার ন্যায় গগনে মেঘোদয় হইলে রুক্মিণী ভ্রান্তিমদে মত্ত হইয়া ভাবেন, তাঁহার প্রাণকান্ত শ্রীকৃষ্ণ বুঝি বা আসিতেছেন! ইনি যেন চণ্ডীদাসের রাধা, ইঁহার মধ্যে রাধার মতই প্রেমের একাগ্রতা, তেমনি তন্ময়তা!—শ্রীকৃষ্ণকে দেখার পর হইতে পদাবলীর রাধা যেমন—

সদাই ধেয়ানে চাহে মেঘপানে
না চলে নয়ান-তারা !

রুক্মিণীও তেমনি বলিয়াছেন—

যত বার হেরি, দেব, আকাশ-মণ্ডলে,
ঘনবরে, শক্র-ধনুঃ-চূড়া-রূপে শিরে ;
তড়িৎ সুধড়া অঙ্গে ; পাদ্য-অর্ঘ্য দিয়া,
সাষ্টাঙ্গে প্রণমি', আমি পূজি ভক্তিভাবে !
ভ্রান্তি-মদে মাতি' কহি,—প্রাণকান্ত মম
আসিছেন শূন্যপথে তুষিতে দাসীরে !

মন্দ্রে যদি ঘনবর, ভাবি, আঁখি মুদি,'—
গোপ-কুলবালা আমি ; বেণুর সুরবে
ডাকিছেন সখা মোরে যমুনা পুলিনে।

হৃদয়ে যে অনুরাগ উদিত হইলে ভক্ত তাহার আরাধ্য দেবতাকে প্রাণেশ্বর-রূপে আরাধনা করিবার জন্য ব্যাকুল হয়, রুক্মিণীর প্রেমের মূলে সেই ভাব বর্তমান। শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি শ্রবণ করিয়া রুক্মিণী শ্রীরাধায় রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছেন এবং প্রিয়মিলনের ঔৎসুক্য অন্তরে বহিয়া তিনি দিনযাপন করিয়াছেন। কৃষ্ণৈকপ্রাণা রুক্মিণী চরিত্রের স্বাতন্ত্র্য এই ভাবতন্ময়তায় ও ভক্তিবিহ্বলতায়। রুক্মিণীর প্রেম শ্রীকৃষ্ণের কেবল নামমাত্র শুনিয়া এবং গুণ শ্রবণে উৎপন্ন হইয়াছে, তাই রুক্মিণীর পত্রখানির মধ্যে রূপযৌবনের প্রসঙ্গ নাই, তাঁহার প্রেম তাই ইন্দ্রিয়-লালসাবিহীন অতীন্দ্রিয় প্রেম।

শূর্পনখা পত্রিকা : শূর্পনখা বালবিধবা। লক্ষ্মণের তরুণ যৌবনের অনিন্দ্য কান্তি তাহার মন হরণ করিয়াছিল। তাই অধীর হইয়া সে পত্রিকা-সাহায্যে লক্ষ্মণের প্রতি তাহার প্রেম নিবেদন করিয়াছে। রূপজ মোহ হইতে শূর্পনখার প্রেম জাত হইলেও, প্রেমে সে মহীয়সী—বীরাঙ্গনার মর্যাদায় সে ভাস্বর হইয়া উঠিয়াছে। প্রেমের অনুরোধে সে সমস্ত সুখসম্পদ্, রাজৈশ্বর্য ত্যাগ করিতে প্রস্তুত। রিক্ততার মধ্যে একমাত্র প্রেমের গৌরবে গরবিনী হইবার সাধ তাহার মনে জাগিয়াছে। ত্যাগের আকাঙ্ক্ষায় সে মহাবীর্যবতী হইয়া উঠিয়াছে।

'কায়-মনঃ-প্রাণ আমি সঁপিব তোমারে!
ভুঞ্জ আসি রাজভোগ দাসীর আলয়ে,
নহে, কহ, প্রাণেশ্বর! অম্লান বদনে,
এ বেশ-ভূষণ ত্যজি, উদাসিনী-বেশে
সাজি', পূজি, উদাসীন, পাদপদ্ম তব!
রতন-কাঁচলী খুলি', ফেলি' তারে দূরে,
আবরি' বাকলে স্তন; ঘুচাইয়া বেণী,
মণ্ডি জটাজূটে শিরঃ, ভুলি' রত্নরাজি,
বিপিন-জনিত ফুলে বাঁধি, হে, কবরী:
মুছিয়া চন্দন, লেপি ভস্ম কলেবরে;
পরি রুদ্রাক্ষের মালা, মুক্তামালা ছিঁড়ি',
গলদেশে! প্রেম-মন্ত্র দিয়ো কর্ণমূলে!
গুরুর দক্ষিণা-রূপে প্রেম-গুরুপদে
দিব এ যৌবন-ধন প্রেম-কুতূহলে!—
প্রেমাধীনা নারীকুলে ডরে কি, হে, দিতে
জলাঞ্জলি, মঞ্জুকেশি, কুল-মান-ধনে
প্রেমলাভ লোভে কভু!'

শূর্পনখা রাজকুমারী। সে ঐশ্বর্য-বিলাসের ক্রোড়ে লালিত হইয়াছে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও দুঃখের কষ্টিপাথরে প্রেমের পরীক্ষা দিতে তাহার মধ্যে কোন দ্বিধাদ্বন্দ্ব জাগে নাই। দুঃখের অগ্নিপরীক্ষায় বিজয়িনী হইয়া সে তাহার প্রেমকে সমস্ত ক্ষুদ্রতা সঙ্কীর্ণতার গণ্ডী হইতে মুক্ত করিতে চাহিয়াছে।

প্রত্যাখ্যান-পত্র: প্রেমবন্ধন ছিন্ন করিবার জন্য জাহ্নবী শান্তনুর কাছে যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহাকে এই শ্রেণীভুক্ত করিয়া দেখা যাইতে পারে। মহাভারতে এই আখ্যায়িকা আছে, কবির কল্পনার উৎস মহাভারতোক্ত সেই কাহিনী। জাহ্নবীর এই প্রত্যাখ্যান-পত্রিকাখানি গাম্ভীর্যে, মহত্ত্বে ও পবিত্রতায় পরিপূর্ণ। যে প্রেম নারীর প্রেমকে অপমানিত করে, এমন প্রেম নারী যে কামনা করে না, সেই কথাটিই এই পত্রিকায় উদ্গীত হইয়াছে।

পত্রিকাখানির মধ্যে ভোগের বাসনা ও ত্যাগের সাধনাকে পাশাপাশি উপস্থাপিত করা হইয়াছে। ইহাতে অন্ধ আবেগ ও নিঃস্বার্থ ত্যাগের চিত্র

রহিয়াছে। শান্তনুর চিত্তে আসক্তির তৃষ্ণা, জাহ্নবীর চিত্ত ত্যাগের মহিমায় সমুজ্জল। অন্ধ আবেগে আচ্ছন্ন শান্তনু কর্তব্যবিমুখ—দায়িত্ববিরহিত প্রেম তাঁহার। রাজকর্তব্য ভুলিয়া তিনি একটা মোহমরীচিকার পিছনে ছুটিয়াছেন। সেই আত্মবিস্মৃতি হইতে রাজাকে মুক্ত করার জন্য জাহ্নবী বলিয়াছেন—

কর রাজ্য সুখে!
পাল প্রজা; দম রিপু; দণ্ড পাপাচারে—
এই হে সুরাজনীতি;—বাড়াও সতত
সতের আদর সাধি' সৎক্রিয়া যতনে।
কি কাজ অধিক কয়ে? পূর্বকথা ভুলি',
করি' ধৌত ভক্তিরসে কামগত মনঃ,
প্রণম সাষ্টাঙ্গে রাজা!

যে প্রেম বাসনাবহ্নি নির্বাপিত করিয়া, আসক্তির উদ্দামতা বিসর্জন দিয়া আহুতিতে চরম চরিতার্থতা লাভ করে, জাহ্নবীর প্রেম সেই শ্রেণীর। আসক্তির গুরুবন্ধন ছিন্ন করিয়া, আসক্তিকে তিনি নিঃশেষে লুপ্ত করিয়া দিতে চাহিয়াছেন। আপন স্বার্থে প্রেমকে গণ্ডীবদ্ধ না রাখিয়া পরার্থপরতায় প্রেমকে চরিতার্থতা দান করিতে চাহিয়াছেন। রাজাকে তিনি মহৎ কর্তব্যে অনুপ্রাণিত করিয়া তুলিবার জন্য ব্যাকুলা হইয়া উঠিয়াছেন। জাহ্নবী ত্যাগে মহাবীর্যবতী। তিনি রাজহংসীর মত। রাজার কামনাসাগরের জলে তিনি তাঁহার পাখা সিক্ত করিতে চাহেন নাই। ইহাতেই তিনি বীরাঙ্গনা।

স্মরণার্থ পত্রিকা: শকুন্তলা, দ্রৌপদী, ভানুমতী ও দুঃশলার পত্রিকা এই শ্রেণীর। এগুলি স্বামীর অদর্শনে ব্যাকুলা, বা স্বামীর অমঙ্গলচিন্তায় প্রোষিত-ভর্তৃকার পত্র।

শকুন্তলা পত্রিকা: দুষ্মন্ত গোপনে গন্ধর্ববিধানে শকুন্তলাকে বিবাহ করিয়াছিলেন, অথচ তাঁহাকে নিজ অন্তঃপুরচারিণী সহধর্মিণীরূপে গ্রহণ করিয়া তাঁহার নারীত্বের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশে তিনি পরাঙ্মুখ। তাই শকুন্তলা পত্র-রচনা করিয়া প্রেমকে মর্যাদা দানের জন্য অনুরোধ জানাইয়াছেন দুষ্মন্তকে। কালিদাসের অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ নাটকে দুষ্মন্তের প্রতি শকুন্তলার পূর্বরাগাত্মক পত্র রচনার কথা আছে। মধুসূদনও শকুন্তলাকে দিয়া দুষ্মন্তের প্রতি পত্র রচনা করাইয়াছেন। কিন্তু মধুসূদনের শকুন্তলার পত্র মিলনের পর আশা-খিন্না

নারীর পত্র। উহাতে প্রথম যৌবনের আবেগ-চাঞ্চল্যের পরিবর্তে একটি বিরহিণী নারীর করুণ বিলাপ উচ্ছ্বসিত হইয়াছে। এই পত্রিকায় শকুন্তলার বিরহিণী রূপটি,—তাঁহার উৎকণ্ঠা, তাঁহার অনুযোগ, তাঁহার করুণ মূর্তিটি কবিত্বমণ্ডিত হইয়া প্রকাশ পাইয়াছে। 'আশামদে মত্ত পাগলিনী' শকুন্তলা বিরহের তাড়নাজাত ভ্রান্তিতে ক্ষণে-ক্ষণেই দুষ্মন্তের রথচক্রধ্বনি শ্রবণ করিয়াছেন। উহা তাঁহার ঔৎসুক্য-উৎকণ্ঠাকে বর্ধিত করিয়াছে।

বীরাঙ্গনা কাব্যের শকুন্তলা কালিদাসের নায়িকার মতই ভূষণপ্রিয়া। এই পত্রিকার ঘটনা-বর্ণনায় মধুসূদন কবি কালিদাসের কাব্যকেই অনুসরণ করিয়াছেন। তবে বীরাঙ্গনার শকুন্তলায় ব্রজাঙ্গনার বিরহিণী রাধিকার ছায়াও পড়িয়াছে। বৈষ্ণব রস-শাস্ত্রসম্মত ভ্রান্তি, দিব্যোন্মাদ প্রভৃতি বিরহের বিভিন্ন চিত্তাবস্থা রাধিকার ন্যায় শকুন্তলার বিরহে আরোপিত হইয়াছে। বিরহিণী রাধার ন্যায় শকুন্তলা প্রিয়তমের স্মৃতি-বিজড়িত মিলনকুঞ্জে ভ্রমণ করিয়া ফিরিয়াছেন।

দ্রৌপদী-পত্রিকা: মহাভারতে অর্জুনের প্রতি দ্রৌপদীর পত্রের কোন উল্লেখ নাই। তবে পঞ্চপতি সত্ত্বেও দ্রৌপদী যে অর্জুনের প্রতি বিশেষ অনুরাগিণী ছিলেন তাহার উল্লেখ আছে। মধুসূদন সেই অনুসারে দ্রৌপদীর প্রকৃতি গড়িয়া লইয়াছেন এবং দেখাইয়াছেন যে, জীবনে বিধিবশে বহুস্বামিত্ব বরণ করিতে বাধ্য হইলেও তাঁহার প্রেমের মধ্যে একনিষ্ঠতার অভাব ছিল না।

দ্রৌপদী-পত্রিকাতে শকুন্তলা-পত্রিকার ন্যায় বিরহিণী রমণীর অন্তর্বেদনা প্রকাশ পাইয়াছে। এই উভয় পত্রিকার বিষয়বস্তু বিরহ হইলেও, পত্রিকা দুইখানির বিশেষত্বও সুস্পষ্ট। শকুন্তলা বিরহিণী—রাজা দুষ্মন্তের বিরহে তিনি কাতরা। দুষ্মন্তের অদর্শনে তিনি অধীরা, দুষ্মন্তের সহিত মিলনের জন্য তিনি ব্যাকুলা। তাঁহার পত্রের ছত্রে ছত্রে সেই ব্যাকুলতা ফুটিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু তিনি সরলা ঋষিবালিকা। তাই তাঁহার পত্রে শুধু বিরহিণীর অন্তর্বেদনাই প্রকাশ পাইয়াছে, উহাতে ব্যঙ্গবিদ্রূপের লেশমাত্র নাই। রাজার কাছে তাঁহার প্রার্থনা—

> আকাশে করেন কেলি লয়ে কলাধরে
> রোহিণী ; কুমুদী তাঁরে পূজে মর্ত্যতলে !—
> কিঙ্করী করিয়া মোরে রাখ রাজপদে !

যাহার পিতার শিক্ষা "কুরু প্রিয়সখীবৃত্তিং সপত্নীজনে"—তিনি ইহা ভিন্ন আর কি প্রার্থনা করিবেন!

কিন্তু পাণ্ডবদিগের বনবাসকালে অর্জুন অস্ত্রশিক্ষার জন্য ত্রিদশালয়ে গমন করিলে পর বিরহ-বিধুরা দ্রৌপদী তাঁহাকে যে পত্রিকা লিখিয়াছিলেন, তাহাতে দ্রৌপদীর আশঙ্কা এবং ব্যঙ্গ মিশ্রিত হইয়া পত্রখানিকে অন্য আর একরূপ মাধুর্যে মণ্ডিত করিয়াছে।

স্বর্গে ইন্দ্রালয়ে তিনি ইন্দ্রের প্রিয় অতিথি, সেখানে ভোগ-সুখের অভাব নাই। প্রলোভনের সামগ্রীও সেখানে অনেক। এই সকল কথা ভাবিয়া এবং স্বামীর বহুপত্নীত্বের কথা স্মরণ করিয়া বিরহিণী দ্রৌপদীর স্বভাবতই মনে হইয়াছে—

হে ত্রিদশালয়-বাসি, পড়ে কভু মনে
এ পাপ-সংসার আর? কেন বা পড়িবে?
কি অভাব তব, কান্ত, বৈজয়ন্ত-ধামে?
দেবভোগ-ভোগী তুমি, দেবসভা-মাঝে
আসীন দেবেন্দ্রাসনে! সতত আদরে
সেবে তোমা সুরবালা,—

* * *

কেহ গায় সুখে,
কেহ নাচে, দিব্য বীণা বাজে দিব্য তালে;
মন্দার-মণ্ডিত বেণী দোলে পৃষ্ঠদেশে!
কস্তুরী-কেশর-ফুল আনে কেহ সাধে!—
কেহ বা অধর-মধু যোগায় বিরলে,
সুমৃণাল-ভুজে তোমা বাঁধি, গুণনিধি!
রসিক নাগর তুমি; নিত্য রসবতী
সুরবালা;—শত ফুল প্রফুল্ল যে বনে,
কি সুখে বঞ্চিত, সখে, শিলীমুখ তথা?

দ্রৌপদী নিজেকে পদ্মের সহিত তুলনা করিয়া তাঁহার বহুস্বামিত্বের সুন্দর ইঙ্গিত করিয়াছেন।—

রবি-পরায়ণা, মরি, সরোজিনী ধনী ;
তবু নিত্য সমীরণ কহে তার কানে
প্রেমের রহস্য-কথা !—অবিরল লুটে
পরিমল ! শিলীমুখ, গুঞ্জরি' সতত,
(কি লজ্জা !) অধর-মধু পান করে সে সুখে !
সৃজিলা কমলে যিনি, সৃজিলা দাসীরে
সেই নিদারুণ বিধি !

এই পত্রিকায় দেখি যে, অন্যান্য পাণ্ডবাপেক্ষা দ্রৌপদী অর্জুনের প্রতিই বেশী অনুরাগিণী। পত্রিকাখানি ভাবাবেগে পূর্ণ—ভাবাবেগে বিহ্বলা হইয়া দ্রৌপদী তাঁহার বিবাহের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী বহু ঘটনা অতি সুন্দরভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। দ্রৌপদীর পূর্বরাগও পত্রিকাখানির মধ্যে চমৎকার ফুটিয়াছে।

ভানুমতী-পত্রিকা : কুরুরাজ দুর্যোধন কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে লিপ্ত। কুরুকুলবধূ ভানুমতী পাণ্ডবদের শক্তিমত্তার কথা চিন্তা করিয়া দুর্যোধনের জন্য অধীরা হইয়া উঠিয়াছেন। স্বামীর অমঙ্গলচিন্তায় কাতরা হইয়া তিনি দুর্যোধনকে যুদ্ধে নিবৃত্ত হইতে পরামর্শ দিয়াছেন। পত্রখানির মধ্যে পাণ্ডবগণের নানা সদ্‌গুণও বর্ণিত হইয়াছে। স্বামীর অমঙ্গলচিন্তায় ভানুমতীর অধীরতা পত্রখানির মধ্যে চমৎকার ফুটিয়া উঠিয়াছে।

দুঃশলা-পত্রিকা : কুরুক্ষেত্র যুদ্ধকালে দুঃশলা তাঁহার স্বামী জয়দ্রথের অমঙ্গলচিন্তায় ব্যাকুলা হইয়া তাঁহার পত্রখানি রচনা করিয়াছেন। পত্রিকাখানির মধ্যে যেখানে অর্জুনের জয়দ্রথবধের সঙ্কল্প বর্ণিত হইয়াছে, উহা কবির বীররস বর্ণনশক্তির অতুলনীয় নিদর্শন।

৪। অনুযোগ-পত্র—কৈকেয়ী ও জনার পত্র : এই দুইখানি পত্র স্বামীর ব্যবহারে পীড়িতা মুখরা নারীর পত্র। দুঃখ, ব্যঙ্গ, তিরস্কার মিলিত হইয়া পত্রিকা দুইখানি পরম উপাদেয় হইয়াছে। কৈকেয়ী এবং জনা উভয়েই স্বামীর ব্যবহারে ব্যথিতা। উভয় পত্রিকার মধ্যেই চরিত্র দুইটির মাতৃত্ববোধ প্রকাশিত। মাতৃত্বের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিতে গিয়া ইঁহারা বীরাঙ্গনা হইয়া উঠিয়াছেন। কিন্তু পত্রিকা দুইখানির মধ্যে পার্থক্যও রহিয়াছে। কৈকেয়ীর পত্র নারীজনোচিত অভিমানে পূর্ণ, জনার পত্রিকা বীরত্বাভিমানে পরিপূর্ণ।

নীলধ্বজের প্রতি জনা : এই পত্রিকার মধ্যে পুত্রশোকাতুরা, ক্ষত্রিয় স্বামীর অক্ষত্রিয় আচরণে ক্ষুব্ধা অভিমানাহতা একটি নারীর চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। মধুসূদনের জনা তাঁহার মেঘনাদবধ কাব্যের চিত্রাঙ্গদা চরিত্রের মতই বঙ্গসাহিত্যে এক অপূর্ব সৃষ্টি। দুইটি চরিত্রেই মাতার স্নেহপ্রবণতার সহিত ক্ষাত্রতেজের সমন্বয় ঘটিয়াছে। জনার পত্রিকাখানিতে নারীহৃদয়ের ক্ষাত্রতেজ অগ্নি-স্ফুলিঙ্গের ন্যায় ফুটিয়া উঠিয়াছে। জনা বীরাঙ্গনা—বীরপুত্রের জননী। একমাত্র প্রিয়পুত্র মহাবীর প্রবীরকে তিনি নিজে যুদ্ধসাজে সজ্জিত করিয়া সমরক্ষেত্রে পাঠাইয়াছিলেন। বীর জননীর বীর পুত্র মহাবিক্রমে ক্ষাত্রধর্ম পালন করিয়া সমরাঙ্গণে মৃত্যু বরণ করিয়াছে। পুত্রশোকের এই নিদারুণ শেলাঘাতে জননী-হৃদয় বিদীর্ণ হইলেও, জনা ক্ষত্রনারী—ক্ষত্রকুলবধূ। তাই শোকবেদনাহত হইয়াও জনা অভিভূত হইয়া পড়েন নাই। পুত্রের বীরত্বে তিনি গৌরববোধ করিয়াছেন—সেই গৌরববোধই তাঁহার অন্তরে শোকবেদনা সহ্য করিবার শক্তি সঞ্চার করিয়াছে।

পুত্রহারা হইয়া জনার মধ্যে প্রতিহিংসানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে। প্রতিশোধ লইবার বাসনায় বড় আশা করিয়া জনা তাঁহার পতির উদ্দেশ্যে যাত্রা করিয়াছেন। মাহেশ্বরীপুরীর আনন্দোৎসবকে তিনি মনে করিয়াছেন রাজা নীলধ্বজের যুদ্ধসজ্জার আয়োজন। কিন্তু রাজসভায় প্রবেশ করিয়া তিনি যাহা দেখিয়াছেন, তাহাতে আশান্বিতা বীরাঙ্গনা নিরাশ হইয়াছেন। তিনি দেখিয়াছেন যে, সেখানে রাজসিংহাসনে তাঁহার পুত্রহন্তা পার্থ উপবিষ্ট, নর্তকীসমূহ নৃত্যগীতের দ্বারা পার্থের মনোরঞ্জনে রত,—স্বামী নীলধ্বজ অর্জুনের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছেন। ইহাতে ক্ষোভে লজ্জায় ঘৃণায় বীরাঙ্গনা জনার অন্তর পরিপূরিত হইয়া গেল। তিনি নীলধ্বজের চিত্তে ক্ষাত্রতেজ উদ্দীপিত করিতে চাহিলেন। কিন্তু জনার সে চেষ্টা ব্যর্থ হইল। তখন তিনি অর্জুনের অন্যায়-যুদ্ধ এবং চরিত্রের দুর্বলতার কথা স্বামীকে স্মরণ করাইয়া দিয়া পুত্রের মৃত্যুর প্রতিহিংসা লইতে বলিয়াছেন। কিন্তু নীলধ্বজ তাহাতেও বিচলিত হইলেন না দেখিয়া, পুত্রহারা জনার নিকট পৃথিবী শূন্য বলিয়া প্রতীয়মান হইল। পুত্রহীনা জনার একমাত্র গতি,—আশ্রয় এবং অবলম্বন ছিলেন পতি। তাঁহাকে বিরূপ দেখিয়া ঐহিক জীবনে জনার আর কোনও আসক্তি রহিল না। তাই সকল জ্বালা নিরসন করিবার মানসে পূতসলিলা জাহ্নবীবক্ষে

জীবন বিসর্জন দিতে তিনি কৃতসঙ্কল্প হইলেন। প্রতিহিংসাময়ী ক্ষত্রিয়-নারী যখন দেখিলেন যে, তাঁহার পুত্রহন্তা তাঁহার স্বামীর রাজসভায় সম্মানিত, তখন সে অপমানভার তাঁহার অসহনীয় মনে হইল। তখন—

মহাযাত্রা করি',
চলিল অভাগী জনা পুত্রের উদ্দেশ্যে।

'নীলধ্বজের প্রতি জনা' পত্রিকার আদ্যোপান্ত ফুটিয়া উঠিয়াছে জনার স্নেহ, তাঁহার স্বামিভক্তি। কিন্তু সূক্ষ্ম ভাবে দেখিতে গেলে, এ সবই ঐ চরিত্রের বাহ্যিক আবরণ, কাঠামোর উপরিস্থিত খড়, কাদামাটি। চরিত্রটির আসল পরিচয় হইতেছে—উহার প্রবল আত্মমর্যাদাবোধ। ইহাকে অবলম্বন করিয়াই এই চরিত্রটির অন্যান্য সকল গুণ বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে।

ক্ষত্রিয়নারীর তেজসমন্বিতা হইলেও জনা মূলত কুলনারী। সেইজন্য এ পত্রিকায় দেখি যে, স্বামীকে তিনি পুত্রহন্তার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রায় উৎসাহিত করিয়াছেন,—নিজ শক্তিতে আপন মনোবাঞ্ছা সিদ্ধির বাসনা তাঁহার মনে একবারের জন্যও জাগে নাই।

—নাহি শক্তি, মিটাই স্ববলে এ পোড়া মনের বাঞ্ছা!

পত্রিকাখানির মধ্যে জনার নারীত্বই ফুটিয়া উঠিয়াছে, জনার দেবীত্ব নহে।

জনার চরিত্রটি ট্র্যাজিক মহিমায় মহিমান্বিত। চরিত্রের নিশ্চল দৃঢ়তায়, নারীত্বের অপার মহিমায়,—ধনে, জনে, মানে—জনার মহীয়সী নারী-চরিত্রটি বিশাল বনস্পতির মত মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছিল। কিন্তু বিধির বিধানে তাঁহার অবস্থা ছিন্নমূল লতার মত হইয়াছে। নিষ্ঠুর নিয়তির হাতের সামান্য ক্রীড়নক হিসাবে যেদিন জনা নিজেকে আবিষ্কার করিয়াছেন, সেইদিন জীবনের প্রতি তিনি সমস্ত আকর্ষণ হারাইয়াছেন,—আত্মবিসর্জনের মধ্য দিয়া নারীত্বের মর্যাদা, কুলবধূর মর্যাদা, পাতিব্রত্যের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াই তিনি পৃথিবীবক্ষ হইতে নিজেকে সরাইয়া লইয়াছেন।

বীরাঙ্গনা কাব্য ঊনবিংশ শতাব্দীর কাব্য। যে যুগে নারী ও নারী-সমাজকে এক নূতন প্রতিষ্ঠা-দানের প্রচেষ্টা শুরু হইয়াছে, যে যুগে সতীদাহ-প্রথা নিবারণের জন্য রাজা রামমোহন রায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, ঈশ্বরচন্দ্র

বিদ্যাসাগর বিধবাবিবাহ প্রবর্তন করার জন্য বদ্ধপরিকর,—এ কাব্য সেই যুগে রচিত। যুগপ্রভাবের অনুবর্তী হইয়াই মধুসূদন তাঁহার কাব্যে নারীর মর্যাদা ও মহিমা, নারীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য স্বীকার করিয়া লইয়াছেন।

পত্রগুলির বিষয় নারীর প্রেম। প্রেমকে এ কাব্যে নারীজীবনের সর্বস্ব করিয়া দেখানো হইয়াছে এবং প্রেম যে নারীকে দুর্জয় শক্তির অধিকারিণী করে, তাহাও প্রদর্শন করা হইয়াছে। মহাঋষিকুলের তারা প্রেমের জন্য সতীত্ব, ধর্ম, লজ্জা, ভয় বিসর্জন দিয়াছেন। রাজৈশ্বর্যের মধ্যে লালিতা রাজকন্যা শূর্পনখা জটাজূটধারী বনবাসী লক্ষ্মণের প্রতি আসক্ত হইয়া রাজবেশ ত্যাগ করিয়া বল্কলধারণ করিতে,—মুক্তামালা ছিঁড়িয়া রুদ্রাক্ষের মালা পরিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই। বীরাঙ্গনা উর্বশীও প্রেমের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া অরণ্যে গিয়া তপস্বিনীবেশে জীবন অতিবাহিত করিতে কুণ্ঠাবোধ করেন নাই।

এ কাব্যের নায়িকাগণ প্রেমের শক্তিতে শক্তিময়ী—প্রতিটি নারীই এ কাব্যে বীরাঙ্গনা। সকল অঙ্গনাই এখানে বীর্যবতী,—সকলের প্রেমেই কবি একটা মহিমা দেখিয়াছেন। নায়িকাদের যে আত্মিক বলের পরিচয় কবি প্রকট করিয়া তুলিয়াছেন, তাহা ভারতীয় সংস্কারের অনুকূল। নারীজীবনে ত্যাগের যে মহিমা কবি দেখাইয়াছেন, তাহাও ভারতীয় সংস্কারকেই অনুসরণ করিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের সবলা নারী যেমন বলিয়াছে—"আমারে প্রেমের গর্বে করো অশঙ্কিনী!"—অন্তরের এই দৃপ্ত তেজ বীরাঙ্গনা কাব্যের প্রত্যেকটি চরিত্রে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। বীরাঙ্গনায় প্রেম 'ভস্ম অপমান শয্যা ছাড়িয়া জ্বলদর্চি তনু' গ্রহণ করিয়াছে। এ কাব্যের নায়িকাগণের প্রেম সকল প্রকার দুর্বলতাকে পরিহার করিয়া ভাস্বর হইয়া উঠিয়াছে।

মধুসূদনের কবিচিত্ত এ কাব্যে একদিকে বাসনার চাঞ্চল্যবিহীন প্রেমের শক্তি দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছে, অন্যদিকে নারীপ্রেমের কামনাবলিষ্ঠ যে আদর্শে তাহাকেও বরণ করিয়া লইয়াছে। এ কাব্যের নায়িকাগণের এক শ্রেণী ত্যাগ ও বিরহের উপাসনা করিয়াছে,—বাসনাকে রুদ্ধ করিয়া একটা আত্মিক আনন্দেই চরিতার্থতা লাভ করিতে চাহিয়াছে। সেখানে কবি দেখাইয়াছেন, আত্মদমনের শক্তি, অসীম ধৈর্যের বল। ইহারই পাশাপাশি কবি দেখাইয়াছেন প্রেমের কামনাবলিষ্ঠ আদর্শকে। এই শ্রেণীর নারী যেন বলিতেছে—

এ প্রেম আমার শুধু ক্রন্দনের নহে ;
যে নারী নির্বাক ধৈর্যে চিরমর্মব্যথা
নিশীথে নয়নজলে করয়ে পালন
দিবালোকে ঢেকে রাখে ম্লান হাসিতলে,—
আমি সে রমণী নহি,—
আমার কামনা কভু নিষ্ফল না হবে।

বাসনার প্রখরতা এই শ্রেণীর নায়িকাচরিত্রের বিশেষত্ব। প্রাণ যাহা আকাঙ্ক্ষা করে, ইঁহারা তাহাই উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন, প্রেমকে জীবনে সত্য বলিয়া জানিয়াছেন, উহার জন্য সর্বস্ব পণ করিয়াছেন।

বীরাঙ্গনা Dramatic Monologue। সেই হিসাবে ইহাতে নাটক-লক্ষণও রহিয়াছে। যে কবিতায় কোন ব্যক্তি, অপর কোন এক বা একাধিক ব্যক্তির উদ্দেশ্যে আপন মনের চিন্তা ভাবনা সংশয় সমস্যাকে প্রকাশ করে, সেই কবিতাকে একোক্তিমূলক নাট্যকাব্য বলা হয়। অভিনয়ের উদ্দেশ্যে ইহা রচিত হয় না, আবৃত্তির জন্যই এই শ্রেণীর রচনা। ইহাতে কবি কোন একটি নাটকীয় পরিপ্রেক্ষিতে একটি চরিত্রকে উপস্থিত করিয়া নেপথ্যচারী হইয়া থাকেন এবং চরিত্রটি ধীরে ধীরে কোন একটি বিশেষ পরিণতি লাভ করে।

এই শ্রেণীর রচনায় কবির ভাব ও ভাষাসংযম, বিশেষত গভীর অন্তর্দৃষ্টি অপরিহার্য। অভিনিবেশের সহিত চরিত্র ও বিষয় নির্বাচন করিয়া, অবান্তর ঘটনা নির্মম হস্তে বর্জন করিয়া, নাটকীয় চরম মুহূর্তটিকে উপস্থিত করিতে হয়। ঘনপিনদ্ধ গঠনের মধ্যে বিষয়ের একমুখিতা, আখ্যাত চরিত্রের সারনির্যাস, এবং একটিমাত্র রসের বিকাশ এই জাতীয় রচনার প্রধান বিশেষত্ব। মনোজগতের ইতিহাস ব্যক্ত করাই কবির লক্ষ্য। এই জাতীয় সৃষ্টি সম্পর্কে পাশ্চাত্ত্যের দুইজন সুবিখ্যাত সমালোচকের মত এইরূপ:—

"Generally in these poems some event crystallizes all the elements of personality about itself, so that a soul's history is told in an episode of an hour".—*W. T. Young.*

"It is essentially a study of character of mental states, of moral crises made from the outside. Thus it is pre-

dominantly psychological, analytical, meditative and argumentative".—*Hudson.*

মধুসূদন তাঁহার বীরাঙ্গনা কাব্যে এই Dramatic Monologue-এর রীতিটিই অনুসরণ করিয়াছেন।

বীরাঙ্গনার নায়িকাগণের উক্তি নাটকীয় action বা ঘটনার গতিকে অব্যাহত রাখিয়াছে। পত্রগুলির মধ্য দিয়া নায়িকাগণ আপন আপন জীবনের অতীত ঘটনাবলী জানাইয়া দিয়াছেন। শকুন্তলার পত্রের মধ্য দিয়া শকুন্তলার গান্ধর্ব-বিবাহ ইত্যাদির প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইয়াছে, দ্রৌপদীর পত্রের মধ্য দিয়া দ্রৌপদীর বহুস্বামিত্ব, তাঁহার পূর্বরাগ, অর্জুনের প্রতি তাঁহার পক্ষপাতিত্ব ইত্যাদি মহাভারতোক্ত বহু ঘটনার অবতারণা করা হইয়াছে। ভানুমতী ও দুঃশলার পত্রের মধ্য দিয়া কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ, দুর্যোধনের অনাচার প্রভৃতি বহু মহাভারতীয় কাহিনী কবি আমাদের গোচর করিয়াছেন। এ কাব্যের পত্রিকাগুলি প্রত্যেক নায়িকার জীবনের এক চরম মুহূর্ত বা সন্ধিক্ষণে রচিত। কবি এই চরম মুহূর্তগুলি নির্বাচন করিয়া নাটকীয় climax সৃষ্টি করিয়াছেন। তারা, জনা প্রভৃতির জীবনের দ্বন্দ্বও এই পত্রকাব্যখানির বিশেষত্ব। এই দ্বন্দ্ব এ কাব্যখানিকে নাটকীয় লক্ষণাক্রান্ত করিয়া তুলিয়াছে।

এই বীরাঙ্গনা কাব্যে 'মেঘনাদবধ কাব্য' ও 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' রচয়িতার হস্তাক্ষর স্পষ্ট হইয়া আছে। মেঘনাদবধ কাব্যের মহাকাব্যোচিত গাম্ভীর্য এবং ব্রজাঙ্গনা কাব্যের lyric-ঝঙ্কার বা মাধুর্য দুই-ই এ কাব্যে রহিয়াছে। ইহাতে একদিকে জনা ও দ্রৌপদীর আহত হৃদয়ের বহির্বিভাস ব্যক্ত হইয়াছে, অন্যদিকে কৃষ্ণপ্রেমবিহ্বলা রুক্মিণী ও বনবাসিনী শকুন্তলার কারুণ্য ফুটিয়া উঠিয়াছে। এ কাব্যের জনা দ্রৌপদী যেন মেঘনাদবধ কাব্যের চিত্রাঙ্গদার প্রতিমূর্তি। শকুন্তলা ও রুক্মিণী বিরহিণী রাধার প্রতিমূর্তি। শকুন্তলার বিরহ রাধাবিরহেরই প্রতিরূপ। কবি নিষ্ঠাবান্ বৈষ্ণবের দৃষ্টিতে রুক্মিণীকে দেখিয়াছেন।

এ কাব্যের প্রত্যেকটি পত্রেই আত্মগত ভাবোচ্ছ্বাস,—ব্রজাঙ্গনা কাব্যের বিশেষত্বও উহাতেই। রাধার অন্তর্বেদনা যেমন ব্রজাঙ্গনা কাব্যের বিষয়বস্তু, তেমনি বীরাঙ্গনার বিষয়বস্তু হইতেছে পুরাণান্তর্গত বিভিন্ন নায়িকার অন্তর্বেদনা। মেঘনাদবধ কাব্যের প্রারম্ভেই কবি যেমন ঘটনা-সমুদ্রের মাঝখানে ঝাঁপ দিয়া পড়িয়াছেন,

তারপর চতুর্থ সর্গে আসিয়া যেমন করিয়া পিছনে চাহিয়া কাহিনীর মূলসূত্রটি ধরিয়া ব্যাখ্যান শুরু করিয়াছেন,—বীরাঙ্গনাতেও এই রীতিটি অনুসৃত হইয়াছে। রামায়ণ, মহাভারত বা ভাগবতের কোন একটি কাহিনীর মধ্যস্থল হইতে কবি তাঁহার বর্ণনা শুরু করিয়াছেন, তারপর নায়িকাগণের উক্তির মধ্য দিয়া প্রাসঙ্গিক সমস্ত অতীতকাহিনীটুকু ব্যক্ত করিয়াছেন।

বীরাঙ্গনা কাব্যের সকল পত্রই অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত। এ কাব্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দ মেঘনাদবধ কাব্যের ছন্দ অপেক্ষাও পরিণতি লাভ করিয়াছে। বীর করুণ প্রভৃতি বিবিধ ভাব এক অমিত্রাক্ষর ছন্দের মধ্য দিয়া কবি যেমন তাঁহার মেঘনাদবধ কাব্যে প্রকাশ করিয়াছিলেন, ঠিক সেইভাবেই এই একটিমাত্র ছন্দকে বাহন করিয়া কবি এ কাব্যে বিভিন্ন ভাব প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। কবি অপ্রচলিত আভিধানিক শব্দ ব্যবহারের দ্বারা মেঘনাদবধ কাব্যে ধ্বনিলালিত্য সৃষ্টি করিয়াছিলেন। বীরাঙ্গনা কাব্যে কবি সে প্রয়োজন বোধ করেন নাই। অপ্রচলিত আভিধানিক শব্দ ব্যবহার না করিয়াই কবি তাঁহার এই কাব্যের ধ্বনিতরঙ্গ (phrasal music) বজায় রাখিয়াছেন। ভাবের গতিপ্রবাহও বীরাঙ্গনা কাব্যে মেঘনাদবধ কাব্য অপেক্ষা স্বচ্ছন্দ স্বাধীন হইয়া উঠিয়াছে।

চতুর্দশপদী কবিতাবলী

বাংলা সাহিত্যে সনেট ছিল না। কাব্যের ক্ষেত্রে মধুস্থদন এই নূতন ভঙ্গিটি প্রবর্তন করেন। মেঘনাদবধ কাব্যরচনার সমসাময়িক কালে মধুস্থদনের মনে বাংলায় সনেট রচনার অভিলাষ জন্মে। ঐ সময়েই তিনি একটি চতুর্দশপদী কবিতা রচনা করেন এবং উহা মনীষী রাজনারায়ণ বসু মহাশয়কে পাঠাইয়া দিয়া লেখেন:

I want to introduce the Sonnet into our language and some mornings ago made the following:

কবি মাতৃভাষা

নিজাগারে ছিল মোর অমূল্য রতন
অগণ্য, তা সবে আমি অবহেলা করি',
অর্থলোভে দেশে দেশে করিনু ভ্রমণ,
বন্দরে বন্দরে যথা বাণিজ্যের তরী।
কাটাইনু কত কাল সুখ পরিহরি'
এই ব্রতে, যথা তপোবনে তপোধন,
অশন, শয়ন ত্যজে, ইষ্টদেবে স্মরি',
তাঁহার সেবায় সদা সঁপি কায় মন।
বঙ্গকুললক্ষ্মী মোরে নিশার স্বপনে
কহিলা—হে বৎস, দেখি তোমার ভকতি
সুপ্রসন্ন তব প্রতি দেবী সরস্বতী।
নিজ গৃহে ধন তব, তবে কি কারণে
ভিখারী তুমি হে আজি, কহ ধনপতি।
কেন নিরানন্দ তুমি আনন্দ-সদনে?

What say you to this my good friend! In my humble opinion, if cultivated by men of genius, our Sonnet in time would rival the Italian.

উদ্ধৃত কবিতাটিই ঈষৎ পরিবর্তিত হইয়া পরে কবির চতুর্দশপদী কবিতাবলী পুস্তকে স্থান পাইয়াছিল।

এই একটি সনেট রচনার মধ্য দিয়া এবং সেই সঙ্গে বাংলা সনেটকে ইতালীয় সনেটের সমপর্যায়ভুক্ত করিয়া তুলিবার আকাঙ্ক্ষার মধ্য দিয়া সেদিন কবির নবসৃষ্টির উল্লাস পরিলক্ষিত হইয়াছিল। কবি তখন মেঘনাদবধ কাব্য রচনায় ব্যাপৃত, তাই নূতন সৃষ্টির ঐ আবেগ তিনি সংযত করিয়া রাখিয়াছিলেন। মহাকাব্য রচনার যে বিরাট্ কল্পনা কবিমানসে সেদিন জাগিয়াছিল, উহাকে তিনি তাঁহার কাব্যলক্ষ্মীর 'কাঁকন কিঙ্কিনীতে হাজার গীতে' ফাটিয়া পড়িতে দিলেন না। কিন্তু পরবর্তী জীবনে ফ্রান্সের ভার্সাই নগরীতে অবস্থানকালে নূতন সৃষ্টির সেই প্রচ্ছন্ন আবেগ শতমুখে উৎসারিত হইল। নব নব সৃষ্টির মধ্য দিয়া বাংলা সাহিত্যের বৈচিত্র্যবিধানের যে আকাঙ্ক্ষা লইয়া কবি বাংলা কাব্যসাহিত্যের ক্ষেত্রে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, সেই আকাঙ্ক্ষার চরিতার্থতাসাধনের জন্য পাশ্চাত্ত্যের সনেটের আদর্শে চতুর্দশপদী কবিতাবলী রচনা করিলেন। বাংলা সাহিত্যে নূতন বৈচিত্র্য আসিল,—নূতন রচনাভঙ্গি প্রবর্তিত হইল।

সনেট বা চতুর্দশপদী কবিতা ইতালীতে সৃষ্ট ও পরিপুষ্ট হইয়াছিল। ইতালীর কবি পেত্রার্ক ইহার জন্মদাতা। ইউরোপের অন্যান্য দেশের সাহিত্য উহা ইতালী হইতে গ্রহণ করিয়াছে। মধুসূদনও তাঁহার চতুর্দশপদী কবিতা পেত্রার্কের আদর্শে রচনা করিতে শুরু করেন। এ সম্বন্ধে গৌরদাস বসাককে তিনি একখানি পত্রে লিখিয়াছিলেন—

I have lately been reading Petrarca, the Italian poet, and scribbling some Sonnets after his manner.

এই আদি বা ইতালীয় সনেটের বহিরঙ্গ গঠনে কতকগুলি নির্দিষ্ট নিয়ম আছে। মিল ও চরণবিন্যাসের সেই কঠিন নিয়মবন্ধনকে না মানিয়া চলিলে সার্থক সনেট হয় না। সনেট চৌদ্দ পংক্তির কবিতা। সেইজন্য বাংলা সনেটের আদি স্রষ্টা মধুসূদন সনেটের বাংলা নামকরণ করিয়াছিলেন—চতুর্দশপদী কবিতাবলী। কিন্তু ঐ চৌদ্দটি পংক্তিই সনেটের সম্পূর্ণ পরিচয় নহে। উহার ভিতরে ও বাহিরে আরও বহু লক্ষণ বর্তমান থাকে। সেই লক্ষণগুলি ভিন্ন কেবলমাত্র চৌদ্দ পংক্তিবিশিষ্ট কবিতাকেই সনেট বলা চলে না।

চতুর্দশ পংক্তির এই শ্রেণীর কবিতায় দুইটি ভাগ—Octave (অষ্টক) ও Sestet বা ষট্‌ক। অষ্টকে চার লাইনের পর একটি বিরাম, আট লাইনের পর পূর্ণচ্ছেদ। এই অষ্টকের মধ্যবর্তী মিলবিন্যাস এইরূপ : ক খ খ ক। ক খ খ ক ॥ ষট্‌কের মধ্যেও দুটি ভাগ,—প্রত্যেকটির নাম ত্রিপদিকা বা tercet। ষট্‌কের মিলবিন্যাসে কিঞ্চিৎ স্বাধীনতা আছে। কবিগণ ষট্‌কের মধ্যে নিম্নলিখিত তিন প্রকারের মিলবিন্যাসের যে কোনও একটি ব্যবহার করিয়া থাকেন। (১) গ ঘ, গ ঘ, গ ঘ। (২) গ ঘ ঙ, গ ঘ ঙ। (৩) গ ঘ ঙ, ঘ গ ঙ। অষ্টক ও ষট্‌কের মিলের এই বৈচিত্র্যই সনেটকে অপূর্ব সঙ্গীতধ্বনিময় করিয়া তুলে এবং সনেটের এই যে দুইটি ভাগ—ভাবের দিক হইতে ইহার প্রয়োজন এই যে, প্রথমার্ধে ভাবের তরঙ্গ উচ্ছলিত হইয়া উঠে, দ্বিতীয় ভাগে সেই ভাবেরই নিবর্তন হয়। ইহা যেন ভাবস্রোতের জোয়ার-ভাঁটা। এ সম্বন্ধে একজন ইংরাজ সমালোচক বলিতেছেন—

The first quatrain makes a statement, the second proves it; the first terzetto has to confirm it, the second draws the conclusion of the whole.

—অর্থাৎ অষ্টকের প্রথম চার লাইনে যাহার প্রস্তাবনা, দ্বিতীয় চার লাইনে তাহাই প্রমাণিত। ষট্‌কের প্রথম তিন লাইনে ঐ প্রমাণকে দৃঢ়তর করা হইয়া থাকে, এবং শেষের তিন লাইনে সমগ্র ভাব-চিন্তার একটা সিদ্ধান্ত খাড়া করা হয়। এ সম্পর্কে সমালোচক মোহিতলাল মজুমদারের মত এইরূপ :

প্রথমটিতে একটি প্রশ্ন, দ্বিতীয়টিতে তাহার উত্তর; প্রথমটিতে বিস্ময়, দ্বিতীয়টিতে তাহার কারণ-নির্দেশ; প্রথমটিতে আক্ষেপ, দ্বিতীয়টিতে সান্ত্বনা; কিংবা প্রথমটিতে কোন কিছুর একটা দিক, দ্বিতীয়টিতে তাহার পরিপূরক হিসাবে অপর দিকের বর্ণনা।

বহিরঙ্গ গঠনের দিক দিয়া সনেটের আর কয়েকটি লক্ষণের মধ্যে প্রধান হইতেছে এই যে—আদি সনেটের শেষ দুই পংক্তি মিলযুক্ত যুগ্মক হয় না। মিলবিন্যাসে অতিশয় সাবধানতার প্রয়োজন—মিলগুলি যেন নামমাত্র মিল না হয়। স্পষ্ট পৃথক মিল খাঁটি সনেটের অপরিহার্য অঙ্গ। নতুবা সনেটের ছন্দ-সঙ্গীত ক্ষুণ্ণ হইয়া থাকে। ভাষায় যেন কোন শৈথিল্য বা অপরিচ্ছন্নতা না থাকে, সে বিষয়েও সনেট-রচয়িতাকে সজাগ সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হয়।

কিন্তু সনেটের সৌন্দর্য কেবল উহার বহিরঙ্গ গঠনকে অক্ষুণ্ণ রাখিলেই

ফুটিয়া উঠে না। বিষয়বস্তু বা ভাবের উপরেও সনেটের সৌন্দর্য নির্ভর করে। বাস্তবিকপক্ষে, সনেট হইতেছে ভাবপ্রকাশের একটি বিশিষ্ট ছাঁচ। ইহার আয়তন আকার ও মিলবিন্যাস—সবই একটি বিশেষ ভাবপ্রকাশের উপযোগী বলিয়াই সাহিত্যে ইহার প্রতিষ্ঠা। কবিমনে ভাবের শত তরঙ্গ উঠিতেছে, তাহারই মধ্য হইতে অতিশয় আবেগপ্রধান একটি ভাবকে ভাষায় ও ছন্দে চিত্রময়ী করিয়া তোলার জন্য সনেটের ছাঁচটি কবিদিগের নিকট বড়ই উপযোগী বলিয়া মনে হইয়াছিল। একটি গভীর আবেগ বা ভাবনাকে গীতিকবিতার ভাবপ্রবাহের উচ্ছ্বাসে অনির্ধারিত সীমায় বিস্তারিত না করিয়া, উহাকে সংহত করিয়া চতুর্দশ পংক্তির নাগপাশে আবদ্ধ করিয়া দেখা গিয়াছিল যে, উহাতে ভাব একটা অপূর্ব শ্রীতে মণ্ডিত হইয়া উঠে। এইজন্যই গীতিকবিতার এক রূপ-বৈচিত্র্য হিসাবে সনেট একদিন আপন আসনটিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে পারিয়াছিল। আজিও ইহা তাহার স্বমর্যাদায় সকল দেশের সাহিত্যক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া রহিয়াছে।

আদি সনেট প্রেমের আবেগে উৎসারিত হইয়াছিল। প্রথমে প্রেমই ছিল সনেটের বিষয়বস্তু। ইউরোপীয় কাব্যসাহিত্যের উৎকৃষ্ট সনেটসমূহ অনুশীলন করিলে দেখা যায় যে, হয় প্রেম নতুবা একটি গভীর আবেগ অভিব্যক্ত হইয়া এই শ্রেণীর কবিতাকে প্রাণময়ী করিয়াছে,—বন্ধনের কঠিন নিগড়ে বাঁধা পড়িয়া কবির ভাবাবেগ এক অপূর্ব সুন্দর কান্তি ধারণ করিয়াছে। ইহাই সনেটের প্রধান বৈশিষ্ট্য। এ সম্পর্কে Sir Arthur Quiller Couch বলেন:

In substance it is a reflective poem on love, or at least some mood of love. It has a unity of its own and must be the expression of a single thought or feeling.

সেক্সপীয়ারের সনেট আদি সনেট (Petrarcan Sonnet) হইতে কিঞ্চিৎ পৃথক। ইহাতে অষ্টক ও ষট্‌কের ভাগ নাই। ইহাতে তিনটি চারি চরণের শ্লোকে একটি ভাব দ্রুত বিকশিত হইয়া অবশেষে একটি পয়ার শ্লোকে সমাপ্তি লাভ করিয়াছে। (সেক্সপীয়ারের সনেট ও আদি সনেটের তুলনায় সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার বলিয়াছেন—

যে ভাব আবেগ-প্রধান, অর্থাৎ একান্ত গীতিপ্রাণ,—যেখানে ভাবকে একটি ভাবনায় কেন্দ্রীভূত করিয়া, উত্থান ও পতনের সঙ্গতি রক্ষা করিয়া, একটি সংযত সঙ্গীতমাধুরী দ্বারা

শুধু প্রাণ নয়, কানে ও মনে তাহার অনুরণনা দীর্ঘ ও দীর্ঘতর করিয়া তুলিবার প্রয়োজন নাই, সেখানে সনেটের এই আকারই উপযুক্ত। ইহাকে আমরা রোমান্টিক সনেট বলিতে পারি। কিন্তু যেখানে ভাবের সহিত ভাবনার গভীরতা ও সংযম এবং তজ্জন্য সূক্ষ্মতর সঙ্গীত-চাতুরীর প্রয়োজন—লিরিক উচ্ছ্বাসকে গভীর অথচ গভীরতর মাধুরীতে মণ্ডিত করার প্রয়োজন—সেইখানে আদি সনেটের রূপই বিশেষ উপযোগী।)

বহিরঙ্গ গঠনের দিক দিয়া এবং ভাববস্তুর দিক দিয়া মধুসূদন তাঁহার অধিকাংশ সনেটেই আদি সনেটের আদর্শ রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। উদাহরণস্বরূপে তাঁহার 'সায়ংকালের তারা' শীর্ষক সনেটটি দেখা যাক।—

কার সাথে তুলনিবে, লো সুর-সুন্দরি,
ও রূপের ছটা কবি এ ভব-মণ্ডলে?
আছে কি লো হেন খনি, যার গর্ভে ফলে
রতন তোমার মত, কহ, সহচরি
গোধূলির? কি ফণিনী, যার সু-কবরী
সাজায় সে তোমা সম মণির উজ্জ্বলে?—
ক্ষণমাত্র দেখি তোমা নক্ষত্র-মণ্ডলে
কি হেতু। ভাল কি তোমা বাসে না শর্বরী।
হেরি অপরূপ রূপ বুঝি ক্ষুণ্ণ মনে
মানিনী রজনী রাণী, তেঁই অনাদরে
না দেয় শোভিতে তোমা সখীদল সনে,
যবে কেলি করে তারা সুহাস অম্বরে
কিন্তু কি অভাব তব, ওলো বরাঙ্গনে,—
ক্ষণমাত্র দেখি মুখ, চির আঁখি স্মরে!

মিল-বিন্যাসের দিক হইতে সনেটটি আদি সনেটের অনুরূপ। অষ্টক ও ষট্‌কের দুইটি স্পষ্ট বিভাগও ইহাতে রহিয়াছে। কিন্তু তথাপি ইহার গঠন সম্পূর্ণ নিখুঁত হয় নাই। কারণ, অষ্টকের মধ্যবর্তী চতুষ্ক দুইটি এবং ষট্‌কের মধ্যবর্তী ত্রিপদিকা দুইটি এখানে বিযুক্ত হইয়া নাই। মধুসূদনের সনেটগুলির চুলচেরা বিচার করিলে আদি (Petrarcan Sonnet) সনেট হইতে কিছু কিছু ব্যতিক্রম চোখে পড়িবে। তাঁহার কোন কোন সনেট আদি সনেটের মিলের রীতিটিকে অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারে নাই। তৎসত্ত্বেও বলা যাইতে পারে যে,

তাঁহার সনেট আদি সনেটের কুলমর্যাদা অনেকখানিই রক্ষা করিয়াছে। বাংলা সাহিত্যে মোটামুটিভাবে তিনিই সনেটের বাহ্যিক রূপটিকে প্রতিষ্ঠা দান করিয়া যান। সনেটের বিষয়বস্তু সম্পর্কেও তিনি একটা সুস্পষ্ট সঙ্কেত রাখিয়া গিয়াছিলেন। বলিতে গেলে, বহিরঙ্গ গঠনের দিক হইতে না হইলেও, বিষয়বস্তুতে মধুসূদনের চতুর্দশপদী কবিতাবলী খাঁটি সনেট। আপন হৃদয়ের নিভৃত-গভীর আবেদন এই কবিতাগুলির সনেট-রূপকে সার্থক করিয়াছে। একজন বিদেশী সনেট সমালোচকের উক্তি মধুসূদনের সনেটগুলি সম্বন্ধে খাটে।—

He pipes a solitary tune of his own life, its devotion, its fervour, its prophetic exaltation, its passion, its despair, its exceeding bitterness.

সনেট কবিহৃদয়ের আলেখ্য-স্বরূপ। ইহার মধ্য দিয়া কবিচিত্তের একটি গভীর আবেগ বা sentiment প্রকাশ পাইয়া থাকে। মধুসূদনের সনেটে তাহাই হইয়াছে। সনেট যে কবির ব্যক্তিগত হৃদয়াবেগ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, অনুভূতি ও মনোভাব প্রকাশের বাহন, মধুসূদনের চতুর্দশপদী কবিতাবলী তাহারই পরিচয়স্থল হইয়া আছে। এই সকল কবিতায় কবির অন্তরের অন্তঃস্থল হইতে ব্যক্তিগত ভাবাবেগ উৎসারিত হইয়াছে।

মধুসূদনের চতুর্দশপদী কবিতাবলী কবির অন্য সমস্ত সৃষ্টি হইতে ভিন্নতর। তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যে, মহাকাব্য মেঘনাদবধ কাব্যে এবং বীরাঙ্গনা কাব্যে ঘটনাকে অবলম্বন করিয়া কবিপ্রতিভার স্ফূর্তি ঘটিয়াছিল, ঐ কাব্য-কয়টিতে কবির কাব্যসৃষ্টির উপকরণ পুরাণের ঘটনাবলী। ঐ সকল কাব্যে কবির ব্যক্তিগত কল্পনা-ভাবনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, আনন্দবেদনার অনুভূতি পুরাণ কাহিনীর আবরণ ভেদ করিয়া অবাধে উৎসারিত হইতে পারে নাই। কিন্তু চতুর্দশপদী কবিতায় কবির মনের নিভৃত সঙ্গীত শুনা গিয়াছে। এই কাব্যে কবির অন্তরের পরিচয় ধ্বনিত হইয়াছে।

ইউরোপীয় সাহিত্যে সনেট আত্মপ্রকাশের অন্যতম মাধ্যম। ইহাকে অবলম্বন করিয়াই সেক্সপীয়ার তাঁহার অন্তরদ্বার উদ্‌ঘাটিত করিয়াছিলেন। মধুসূদনও ইহার মধ্য দিয়া তাঁহার আত্মগত অনুভূতি প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। নিজের মনের যে আশা-কল্পনা, আনন্দ-বেদনা তাঁহার অন্ত

কাব্যে স্ফূর্তি লাভ করিতে পারে নাই, তাহাকে চতুর্দশপদী কবিতায় প্রকাশ করিয়া কবি তৃপ্তি মানিয়াছেন। প্রাচীন সংস্কৃত ও বাংলা সাহিত্য কবিকল্পনাকে কিভাবে উদ্দীপিত করিয়াছিল, পূর্বগামী কবিদিগের প্রতি কবির ঋণ কতখানি, বাংলার পূজাপার্বণ, বাংলার কবিওয়ালা পাঁচালীকারের গান, আগমনী সঙ্গীত কবির হৃদয়ে যে ঝঙ্কার তুলিয়াছিল, পুরাণকাহিনী অনুসরণ করিতে গিয়া সেই সকল অনুভূতি তেমনি অভিব্যক্তি লাভ করিতে পারে নাই। সনেটে উহারই অভিব্যক্তি ঘটিল।

কাব্যের লক্ষণ নির্দেশ করিতে গিয়া মিলটন বলিয়াছেন—একটা সুগভীর আবেগ এবং বস্তুতন্ত্রতার উপর কাব্যের উৎকর্ষ নির্ভর করে। মধুসূদনের সনেটে আমরা এই দুইটি লক্ষণই দেখিতে পাই। একটা আবেগের বশবর্তী হইয়া কবি তাঁহার চতুর্দশপদী কবিতাবলী রচনা করিয়াছেন এবং সেই আবেগের বশবর্তী হইয়া তিনি 'শুধু শূন্য দিবসের অলস গায়কে' পরিণত হন নাই,—মধুসূদনের সনেট মাটির রস আকর্ষণ করিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। পার্থিব সৌন্দর্যের সুতীব্র অনুভূতি; বাংলার পূজা-পার্বণ উৎসবে কবির আনন্দ-উদ্বেলতা চতুর্দশপদীর বিশেষত্ব। ধরণীর রূপরস-বর্ণ-গন্ধ-গান কবিচিত্তকে কতখানি বিমুগ্ধ করিয়াছিল, তাহার কথায় এই কাব্যখানি পরিপূর্ণ। মুগ্ধ কবিচিত্ত এই কাব্যে পৃথিবীর সৌন্দর্যের জয়গান করিয়াছে।

মধুসূদনের চতুর্দশপদীতে নির্বিশেষ সৌন্দর্যসাধনা কাব্যের প্রবৃত্তি হইয়া দাঁড়ায় নাই, তাঁহার কবিতা জাতির এবং মাটির সহিত কোনোখানে আত্মীয়তা-বন্ধন ছিন্ন করে নাই। আপন ব্যক্তিজীবনের অভিজ্ঞতা, আশা-আনন্দ,—জাতি ও জন্মগত সংস্কারই কবির কাব্যের বিষয় হইয়াছে। বাংলার মাটিকে, বাংলার ভাব-ভাবনা, কল্পনা ও অনুভূতিকে অপার মমতায় অবলম্বন করিয়া মধুসূদনের চতুর্দশপদী কবিতাবলী জন্মলাভ করিয়াছে। বাংলার সরস শ্যামল কুঞ্জবিতান কবির চতুর্দশপদী কবিতার মধ্য দিয়া আপন তনুলতাটিকে উচ্ছ্রিত করিয়াছে। খাঁটি বাঙ্গালীর মনোভাব, বাঙ্গালীর জাতীয় চিন্তা তাঁহার কবিতায় ফুটিয়া উঠিয়াছে।

বাংলার 'বৌ কথা কও পাখী', 'দেবদোল', 'শ্রীপঞ্চমী', 'আশ্বিন মাস', 'নিশা-কালে নদীতীরে বটবৃক্ষতলের শিবমন্দির', 'বটবৃক্ষ', 'কপোতাক্ষ নদ', 'নদীতীরে প্রাচীন দ্বাদশ-শিবমন্দির', 'বিজয়া দশমী', 'কোজাগরী লক্ষ্মীপূজা', 'শ্যামাপক্ষী',

প্রভৃতি কবির কাব্যরচনার ভিত্তিভূমি হইয়াছে। স্বদেশের ছোটখাট তুচ্ছতম ঘটনা ও বস্তু কবিচিত্তে আনন্দের উৎস খুলিয়া দিয়াছে। আশ্বিনের আগমনী গান শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালীর মনে যে আশা ও আনন্দ পুঞ্জীভূত হইয়া উঠে, অথবা বিজয়া দশমীর দিনে বাঙ্গালীর মনে যে মহাশূন্যতার অনুভূতির সৃষ্টি হয়, সেই সকল আনন্দ বেদনাময় ভাবকে অবলম্বন করিয়া মধুসূদন তাঁহার চতুর্দশপদী কবিতা রচনা করিয়া গিয়াছেন। কবির চোখে এই বাস্তব জগৎটাই মায়ার অঞ্জন পরাইয়া দিয়াছিল, এই বস্তু-জগৎই ছিল তাঁহার কল্পনার, তাহার ভাবুকতার উৎস।

যে সময়ে মধুসূদন তাঁহার চতুর্দশপদী কবিতাবলী রচনা করেন, তখন তাঁহার জীবনে অভাব-অনটন, সম্মুখে নৈরাশ্যের অন্ধকার। এরূপ অবস্থায় সান্ত্বনা পাইবার জন্য কবি অতীতের দিকে তাঁহার দৃষ্টিকে প্রসারিত করিয়াছেন। সে সময়ে কবিচিত্তে ভবিষ্যতের রঙীন স্বপ্ন নাই। তাই বিগত দিনের দিকে অধীর হইয়া কবি এ কাব্যে তাকাইয়াছেন এবং সেখান হইতে যখন প্রাণবিধায়ী দক্ষিণসমীরণের উচ্ছ্বাস আসিয়া তাঁহাকে স্পর্শ করিয়াছে, কবি তখন তাহাতে অপার সান্ত্বনা ও শান্তি খুঁজিয়া পাইয়াছেন। জীবন-সংগ্রামে বিপর্যস্ত কবি অতীতজীবনের ছোট ছোট ক্ষণিক ভাবনার তরঙ্গ-চূড়ায় বিচরণ করিয়া জীবনের দুঃখবিপর্যয়ের বেদনা ভুলিতে চেষ্টা করিয়াছেন। চতুর্দশপদীর অধিকাংশ কবিতা কবির নিজজীবনের অতীত স্মৃতিকে কেন্দ্র করিয়া রচিত। এখানে অতীতের স্মৃতি কল্পনার রঙে রঙীন হইয়া উঠিয়াছে। ছোট ছোট ভাব অতীতের সংস্কৃতি আর স্মৃতি হইতে পাওয়া। কবির অবচেতন মনে যে-সব স্মৃতি বা চিত্র প্রকাশের অপেক্ষায় ছিল, এই কাব্যে তাহাদেরই প্রকাশ ঘটিয়াছে,—অনঙ্গ স্মৃতি চতুর্দশপদীতে অঙ্গ ধরিয়াছে। কবি তাঁহার সমস্ত জীবন খুঁজিয়া খুঁজিয়া সুদীর্ঘকালের ব্যবধান পার হইয়া তাঁহার চেতনার প্রথম স্ফুলিঙ্গগুলি উদ্ধার করিয়া আনিয়াছেন। অতীতের মালঞ্চ হইতে কবি এখানে মধু আহরণ করিয়াছেন।

অতীত-জীবনের যাহা কিছু কবি তাঁহার চতুর্দশপদীতে বলিয়াছেন, তাহাতেই নিজের প্রাণের খানিকটা তাপ তিনি সঞ্চার করিয়া দিয়াছেন। ইহাতেই মধুসূদনের সনেটে কবির হৃৎস্পন্দন শুনা গিয়াছে। সমস্ত কাব্যখানি যেন কবির হৃদয়নিঃসৃত একটা উচ্চরব হইয়া উঠিয়াছে, যেন একটা দীর্ঘ একক উক্তি, একটা সশব্দ জীবন হইয়া উঠিয়াছে।

চতুর্দশপদীতে কবির রোমান্টিক কল্পনাপ্রবণতার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। এ কাব্যে কবির মধ্যে কল্পনার প্রাধান্য,—কবি এখানে ভাববাদী, কল্পনার ইন্দ্রধনুরাগ তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন। রোমান্টিক্ বলিয়াই কবি এখানে বর্তমানের বন্ধনবিমুক্ত হইয়া অতীত স্মৃতিগুঞ্জরণে মাতিয়া উঠিয়াছেন। রোমান্টিক বলিয়াই কবি তাঁহার এই কাব্যে সাধারণ জিনিসের মহিমার দিকটি দেখিয়াছেন,—বাংলার মাঠ-ঘাট-বাটকে এক প্রীতিস্বপ্নময় কবিতার দেশ করিয়া তুলিয়াছেন।

আখ্যায়িকা-নিরপেক্ষ কবিতা রচনা আধুনিক যুগের বিশেষত্ব। এ যুগে জীবনের খণ্ড ক্ষুদ্র আনন্দবেদনার অনুভূতিকে কবিগণ তাঁহাদের কাব্য-মধ্যে ফুটাইয়া তুলিতেছেন। ঈশ্বর গুপ্তে আমরা ইহার সূত্রপাত দেখিয়া-ছিলাম। মধুসূদনের চতুর্দশপদীতে উহাই দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। মধুসূদন মহাকাব্যরচনার যে আদর্শ বাংলার কবিগোষ্ঠীর সামনে ধরিয়া দিয়া গিয়াছিলেন, উহা স্থায়ী হয় নাই। কিন্তু 'নিজের ছন্দে নিজের মনের কথা বলিবার' যে রীতিভঙ্গিটি তিনি চতুর্দশপদী কবিতাবলী রচনা করিয়া প্রতিষ্ঠিত করিয়া-ছিলেন, উহা বঙ্গসাহিত্যে স্থায়িত্ব লাভ করিয়াছিল।

পাশ্চাত্য প্রভাব

পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের প্রভাব সূচিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগ আরম্ভ হইয়াছে। বাংলা সাহিত্যের এই নবযুগের উন্মেষে পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যই যে সহায়তা করিয়াছে, প্রেরণা জোগাইয়াছে—একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

উনবিংশ ও বিংশ শতকের বাংলা সাহিত্য পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের আদর্শে গড়িয়া উঠিয়া বিশ্বসাহিত্যের পর্যায়ে উন্নীত হইয়াছে। এ যুগের বাংলা সাহিত্যে পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের সুর, ছন্দ, ভাব, কল্পনাদর্শ ও বিচিত্র রূপ-সৃষ্টির (Form) অসীম প্রভাব রহিয়াছে। কি কাব্যসাহিত্য, কি গদ্যসাহিত্য, কি নাট্যসাহিত্য—আধুনিক বাংলা সাহিত্যের কোনও বিভাগই পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের প্রভাব এড়াইয়া চলিতে পারে নাই।

বাংলার আধুনিক যুগের কবিগণের ভাব ও কল্পনাদর্শের মূলে পাশ্চাত্ত্য কাব্যসাহিত্য নানাদিক দিয়া নানাভাবে প্রভাব বিস্তার করিয়া বাংলা কাব্য-সাহিত্যকে সমৃদ্ধিশালী করিয়া তুলিয়াছে। আধুনিক যুগের প্রারম্ভে যে অমিত-প্রতিভাশালী কবির কাব্যের মধ্য দিয়া পাশ্চাত্ত্য কাব্যসাহিত্যের স্রোত সর্বপ্রথম সচেতনভাবে প্রবেশ করিয়া বাংলা সাহিত্যকে আধুনিকতায় দীক্ষা দিয়াছিল, তিনি মাইকেল মধুসূদন। মধুসূদনই সর্বপ্রথম তাঁহার কবিবীণায় আধুনিক আদর্শের সঙ্গীতধ্বনি তুলিয়া পাশ্চাত্ত্য কাব্যরসপিপাসু বাঙ্গালী পাঠকসমাজের মনোরঞ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার সম-কালীন কবিগণের মধ্যে রঙ্গলালে পাশ্চাত্ত্য প্রভাব ছিল সত্য। কিন্তু রঙ্গলাল একেবারে সম্পূর্ণভাবে প্রাচীন সাহিত্যের প্রভাবমুক্ত ছিলেন না। তাঁহার কাব্যসমূহে মঙ্গলকাব্যের প্রভাব সুস্পষ্ট। কিন্তু মধুসূদন বিদেশী সাহিত্য হইতে আখ্যায়িকা, ভাব, কল্পনাদর্শ, উপমা, ছন্দ ইত্যাদি—কাব্য-রচনার যাবতীয় আদর্শ আহরণ করিয়া বঙ্গসাহিত্যে নূতন আকর্ষণী শক্তি সঞ্চার করেন।

শিক্ষার মধ্য দিয়া মধুসূদনের মনে পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের বীজ উপ্ত

হইয়াছিল। পরবর্তীকালে সেই বীজ অঙ্কুরিত হইয়া বাংলা সাহিত্যকে ফলে-ফুলে সুশোভিত করিয়া তুলিয়া—বাংলা সাহিত্যে নূতন প্রাণসঞ্চার করিয়া দিয়াছিল। যৌবনে হিন্দু-কলেজে—বিশেষত বিশপ্‌স্ কলেজে অধ্যয়ন-কালে তিনি পাশ্চাত্ত্য কাব্যসাহিত্যের রস ভাল করিয়া আস্বাদন করিয়াছিলেন এবং পাশ্চাত্ত্য কাব্যরসের সহিত পরিচয়লাভই তাঁহার অন্তরে কবি হইবার আকাঙ্ক্ষা জাগাইয়া দিয়াছিল—পাশ্চাত্ত্য কাব্যসাহিত্যের অভ্যন্তরে যে ধরণের দৃষ্টিভঙ্গি ও কলানৈপুণ্য আছে, বঙ্গসাহিত্যে তাহা প্রবর্তিত করিবার আকাঙ্ক্ষা জাগাইয়া দিয়াছিল। যৌবনে পঠদ্দশাতেই বায়রন তাঁহার তৃপ্তি-সাধন করিতেন, মিলটন, হোমার, ভার্জিল, দান্তে, ট্যাসোর কাব্যানুশীলন তাঁহার কল্পনাকে ও সৃজনী-প্রতিভাকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল। কীট্‌সের সৌন্দর্যতত্ত্ব তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়াছিল! কীট্‌সের সৌন্দর্যতত্ত্ব ও মহাকবি কালিদাসের সৌন্দর্যতত্ত্বের সমন্বয়ে কবির তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য সৃষ্ট হইয়া-ছিল। ঐ কাব্যে কীট্‌সের মতই কবি বস্তু-নিরপেক্ষ রূপাতীত (Absolute, Abstract) সৌন্দর্যের স্তুতিগান করিয়া গিয়াছেন।

মধুসূদন একদিকে ভারতীয় সাহিত্যের বাল্মীকি, ভারবি, ভবভূতি, কৃত্তিবাস এবং কাশীরাম দাস—অপরদিকে পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের হোমার, ভার্জিল, দান্তে, ট্যাসো, মিলটন, বায়রন, কীট্‌স প্রভৃতির নিকট হইতে কাব্যমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। এখানে একটি কথা বলিয়া রাখা ভাল যে, রোমান্টিক কবিগণের প্রভাব অপেক্ষা হোমার, ভার্জিল, দান্তে, ট্যাসো, মিলটন এই কয়জন ক্লাসিক কবির প্রভাবই মধুসূদনের কাব্যসমূহে অধিক পরিমাণে বর্তমান। তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যের মধ্যে রোমান্টিক ভাবকল্পনা মধুসূদনের কবিদৃষ্টি ও কল্পনাভঙ্গিকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে বটে, কিন্তু ইউরোপীয় সাহিত্যের Romantic Revival-এর উত্তরকালে জন্মগ্রহণ করিয়াও মধুসূদন ছিলেন প্রাণে-মনে ক্লাসিক আদর্শের পক্ষপাতী। তাই তিনি কাব্যসৃষ্টিতে রোমান্টিক আদর্শ অপেক্ষা প্রাচীন ক্লাসিক আদর্শের অনুসরণ করিয়াই চলিয়াছিলেন।

মধুসূদন বাংলা কাব্যসাহিত্যে পাশ্চাত্ত্য কাব্যের ঐশ্বর্য আমদানী করিয়া—মধুলোভাতুর মক্ষিকার ন্যায় নানাদেশীয় কাব্যকুসুম হইতে মধু আহরণপূর্বক অপূর্ব মধুচক্র রচনা করিয়া ইহাই প্রতিপন্ন করিয়া দিয়া গেলেন

যে, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য ভাবের সম্মিলনেই বাংলার ভাবীকালের সাহিত্য গঠিত হইবে, এবং তবেই তাহা বিশ্ব-সাহিত্যের দরবারে আসন পাইবার যোগ্য হইবে। তাঁহার কাব্যে মিলটনের ছন্দৈশ্বর্য ও ভাবসম্পদ বর্তমান, তাঁহার কাব্যে হোমার, ভার্জিল, দান্তে, ট্যাসো প্রভৃতি ইউরোপীয় ক্লাসিক কবিদিগের ভাবৈশ্বর্য ও রচনারীতির প্রভাব অনুভূত হয়।

মধুসূদনেরই প্রবর্তিত আদর্শ অনুসারে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের ভাবের সম্মিলনে আধুনিক বাংলা কাব্যসাহিত্য গঠিত হইল। বাংলা কাব্যসাহিত্য এক নূতন পথে জয়যাত্রা করিল।

কবি যদিও দেশবিদেশের 'কবি-চিত্ত-ফুলবন-মধু' লইয়া তাঁহার কাব্যসমূহের সৌন্দর্যসাধন করিয়াছেন, কিন্তু বিভিন্ন কবির ভাব চরিত্র ও কল্পনাভঙ্গি মধুসূদন তাঁহার কাব্যে ব্যবহার করিয়াছেন নববেশে সুসজ্জিত করিয়া। সুবিখ্যাত কবি-সমালোচক Stopford Brooke মিলটন সম্বন্ধে যে উক্তি করিয়া গিয়াছেন, তাহা মিলটনের কাব্যমন্ত্রে দীক্ষিত মধুসূদন সম্বন্ধেও প্রযোজ্য।

Stopford Brooke বলিয়াছেন—Milton was a scholar, and in his writings we continually find echoes of what we fancy we have heard before. But the alchemy of his genins turns the ore of his predecessors into pure gold; he borrows but to improve and give it back as his own. It little matters whence this and that came from; the poem, as we have it, is Milton's in every line; in thought, in style, in build, in imaginative and moral power.

মিলটনের মতই মধুসূদনের প্রতিভার অলোকসামান্য আলোকসম্পাতে বিবিধ কবির ভাব, কল্পনাভঙ্গি, রূপসৃষ্টির আদর্শ, ছন্দ প্রভৃতি মধুকবির কাব্যে রূপান্তর লাভ করিয়া নূতন মূর্তি ধরিয়াছে। মনীষী রাজনারায়ণ বসু, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর—ইঁহারা মধুসূদনের প্রতিভার স্বরূপ বিশ্লেষণ করিতে গিয়া বলিয়াছিলেন—

Whatever passes through the crucible of the author's mind receives an original shape.

মধুসূদনের 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যে' রোমান্টিক কবি শেলী, কীট্সের

কল্পনাভঙ্গি বর্তমান ; আর তাঁহার মেঘনাদবধ কাব্যে হোমার, মিলটন, ভার্জিল, দান্তে, ট্যাসো প্রভৃতি ক্লাসিক কবিদিগের প্রভাব রহিয়াছে। মেঘনাদবধ কাব্য রচনাকালে রাজনারায়ণ বসু মহাশয়কে মধুসূদন একখানি চিঠি লিখিতেছেন—সেই পত্রখানিতে কবি তাঁহার ঐ কাব্যের উপর পাশ্চাত্ত্য প্রভাবের কথা নিজেই স্বীকার করিয়াছেন। সেখানে স্পষ্টই তিনি ইঙ্গিত দিয়াছেন যে, পাশ্চাত্ত্য আদর্শ অনুযায়ী তিনি তাঁহার কল্পনা ও বর্ণনাকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছেন।—

I never read any poetry except that of Valmiki, Homer, Vyasa, Virgil, Kalidas, Dante (in translation), Tasso, (do), and Milton. These কবিকুলগুরুs ought to make a fellow a first rate poet—if nature has been gracious to him.

মেঘনাদবধ কাব্যের ছন্দে, গঠনে, বহু ঘটনার অনুসরণে এবং ভাষায় মিলটন, হোমার, ট্যাসো, দান্তে, ভার্জিল প্রভৃতি কবিদের প্রভাব বেশ স্পষ্ট হইয়াই আছে। ঐ কাব্যের রচনারীতি-বিষয়ে (form) মিলটন এবং হোমারই কবির উপর সমধিক প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। গ্রীক পৌরাণিক আখ্যায়িকা কবিকে মুগ্ধ করিয়াছিল ; সেই হেতু তিনি গ্রীক পৌরাণিক আখ্যায়িকাসকল কৌশলে এই কাব্যের মধ্যে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। গ্রীক রচনাদর্শ অনুযায়ী মেঘনাদবধ কাব্যখানি রচনা করিতে গিয়া কবি মধুসূদন দেবতাদিগকে যুধ্যমান উভয় পক্ষে যোগদান করাইয়াছেন। মেঘনাদবধ কাব্যের দেবতাগণ গ্রীক আদর্শে গঠিত হইয়াছে। মেঘনাদবধ কাব্যের বিষয়সজ্জা প্রভৃতির উপর গ্রীক প্রভাব রহিয়াছে।

রামায়ণের কাহিনী লইয়া রচিত হইলেও—মহাকবি বাল্মীকি আর কৃত্তিবাসের নিকট কবি তাঁহার কাব্যের মূল সুরের জন্য ঋণী হইলেও—মিলটনের প্যারাডাইস্ লষ্ট্, হোমারের ইলিয়াড্, ভার্জিলের ইনিড্, দান্তের ডিভাইন কমেডি, ট্যাসোর জেরুজালেম ডেলিভার্ড প্রভৃতি বিভিন্ন পাশ্চাত্ত্য কাব্যের ঘটনা ও ভাবরাশি পরিবর্তিত হইয়া মেঘনাদবধের অন্তর্নিবিষ্ট হইয়াছে। কাব্যে যুদ্ধবর্ণনাকে প্রাধান্য না দিয়া,—চরিত্রসৃষ্টি, ঘটনা-বর্ণনা প্রভৃতির প্রতি কবি বেশী মনোযোগী। মেঘনাদবধ কাব্যের এক সপ্তম সর্গ ছাড়া যুদ্ধের প্রত্যক্ষ বর্ণনা কবি করেন নাই,—অন্যান্য সকল সর্গে নেপথ্যে যুদ্ধের দুন্দুভিধ্বনি শুনা গিয়াছে। কাব্যরচনার এই রীতি মধুসূদন মিলটন হইতে পাইয়াছিলেন।

প্রথম সর্গে গ্রন্থের প্রারম্ভেই কবি হোমার, মিলটন প্রভৃতি পাশ্চাত্ত্য কবিদিগের আদর্শে কল্পনাদেবীর বা ইউরোপীয় কাব্যের Muse-এর বন্দনা করিয়াছেন। কবির "তুমিও আইস, দেবি! তুমি মধুকরী কল্পনা!" —এই অংশটি আমাদিগকে মিলটনের প্যারাডাইস্ লষ্টের—"Sing Heavenly Muse", এবং ইলিয়াড কাব্যের "Heavenly Goddess Sing" প্রভৃতি অংশ স্মরণ করাইয়া দেয়। কি তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যে, কি মেঘনাদবধ কাব্যে,—কবি শুধুমাত্র বাগ্‌দেবী বীণাপাণির বন্দনাগান করিয়া ক্ষান্ত হন নাই। ইউরোপীয় কবিগণের আদর্শে কল্পনার অধিষ্ঠাত্রী দেবীর বন্দনাও করিয়াছেন। কারণ, এই কল্পনাসুন্দরী কাব্যলক্ষ্মী কবির ভাব এবং কল্পনা উৎসারিত করিয়া থাকেন।

সেই কবি মোর মতে; কল্পনা-সুন্দরী
যার মনঃ-কমলেতে পাতেন আসন!

মেঘনাদবধ কাব্যের প্রথম সর্গে বারুণীর কেশরচনার বর্ণনা আছে। বারুণীর সেই চিত্রটি,—সমুদ্র-জলতলে প্রবাল-আসনে উপবিষ্টা বারুণীর কেশরচনার চিত্রটি—গ্রীক মহাকাব্য ইলিয়াডের সমুদ্রদেবী থেটিস এবং মিলটনের 'কোমাস্' (Comus)-এ বর্ণিত সেভার্ন (Severn) নদীর অধিষ্ঠাত্রী দেবী স্যাব্রিনা (Sabrina) ও অপ্সরী লিজিয়ার (Ligea) আদর্শে সৃষ্ট। মিলটন স্যাব্রিনার চিত্রটি ফুটাইয়া তুলিতে গিয়া বলিয়াছেন—

'Sabrina fair,
Listen where thou art sitting
Under the glassy, cool translucent wave
In twisted braids of lilies knitting
The loose train of thy amber dropping hair.'

—*Comus*

লিজিয়া সম্বন্ধে মিলটন বলিতেছেন—

And fair Ligea's golden comb,
Wherewith she sits on diamond rocks.
Seeking her soft alluring locks.

—*Comus*

মেঘনাদবধ কাব্যের প্রথম সর্গে মেঘনাদের প্রমোদকানন, প্রমীলার সহিত তাঁহার তথায় অবস্থান, মেঘনাদ-ধাত্রী প্রভাষার তথায় গমন এবং লঙ্কার দুর্দশা শ্রবণে তাঁহার আত্মগ্লানি ও দেশাত্মবোধের উন্মেষ— এ সবই ট্যাসোর জেরুজালেম ডেলিভার্ড-এর একটি দৃশ্যের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। ট্যাসোর কাব্যে মেঘনাদের মতই রাইনাল্ডো (Rinaldo) প্রমোদকাননে মায়াবিনী আর্মিডার (Armida) প্রেমে আবদ্ধ হইয়া আত্ম-বিস্মৃত হইয়া অবস্থান করিতেছিলেন এবং মেঘনাদধাত্রী প্রভাষার মত চার্লস ও য়ুবাল্ডো (Charles এবং Ubaldo) রাইনাল্ডোকে যুদ্ধের জন্য আর্মিডার প্রমোদপুরী হইতে আনিতে গিয়াছিল। মেঘনাদকে যুদ্ধযাত্রায় উৎসাহিত কবিবার জন্য প্রভাষা লঙ্কার দুর্দশা বর্ণনা করিয়া বলিয়াছিল—

হায় পুত্র! কি আর কহিব
কনক-লঙ্কার দশা! ঘোরতর রণে
হত প্রিয় ভাই তব বীরবাহু বলী!
তার শোকে মহাশোকী রাক্ষসাধিপতি,
সসৈন্যে সাজেন আজি যুঝিতে আপনি।

এবং—

হায়, পুত্র! মায়াবী মানব
সীতাপতি তব শরে মরিয়া বাঁচিল।
যাও তুমি ত্বরা করি'; রক্ষ রক্ষঃকুল-
মণি, এ কাল সমরে, রক্ষঃ-চূড়ামণি।

মেঘনাদধাত্রীর এই উৎসাহবাণী ট্যাসোর কাব্যের অন্তর্গত নিম্নোদ্ধৃত অংশের অনুরূপ।—

All Europe now and Asia be in war,
And all that Christ adore and fame have won
In battle strong, in Syria fighting are;
But thee alone, Bertold's noble son,
This little corner keeps, exiled far
From all the world, buried in sloth and shame
A carpet champion for a wanton dame.

Up, up, our camp and Godfrey for thee send.
The fortune, praise and victory expect,
Come fatal champion, bring to happy end
This enterprise begun, and all that sect
Which oft thou shaken hast to earth full low
With thy sharp brand strike down, kill, overthrow.

লঙ্কার দুর্দশা এবং বীরবাহুর মৃত্যু-সংবাদ শ্রবণ করিয়া মেঘনাদের আত্মগ্লানি হইয়াছিল—যুদ্ধযাত্রার জন্য তাঁহার বীরহৃদয় নাচিয়া উঠিয়াছিল। তিনি তাঁহার বিলাসের উপকরণ ফেলিয়া, কণ্ঠের মালিকা ছিন্ন করিয়া রাইনাল্ডোর মত যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন। মেঘনাদবধ কাব্যের প্রথম সর্গের অন্তর্গত—

ছিঁড়িলা কুসুমদাম রোষে মহাবলী

এই অংশের সহিত ট্যাসোর নিম্নোদ্ধৃত অংশটি তুলনীয়।

His nice attire in scorn he rent and tore ;
For of his bondage vile that witness bore,
That done he hasted from that charmed fort.

মেঘনাদের যুদ্ধযাত্রায় প্রমীলার আক্ষেপের সহিত ট্যাসোর কাব্যের আর্মিডার খেদের সাদৃশ্য আছে। মেঘনাদ ও প্রমীলার বিদায়চিত্রটি হোমার-রচিত ইলিয়াডের হেক্‌টর ও তৎপত্নী অ্যাণ্ড্রোমেকির বিদায়চিত্রের অনুরূপ।

মেঘনাদবধ কাব্যের দ্বিতীয় সর্গে গ্রীক প্রভাবই সর্বাপেক্ষা অধিক। রামায়ণে রাঘবপক্ষে দেবদেবীগণের প্রত্যক্ষ সহকারিতার কথা কোথাও নাই। ইলিয়াডের আদর্শে কবি এই সর্গে রামায়ণে অনুল্লিখিত ঘটনার সমাবেশ করিয়াছেন—হোমারের মত তিনি দেবদেবীগণকে লঙ্কাযুদ্ধকালে অবতীর্ণ করাইয়াছেন।

মেঘনাদবধের তৃতীয় সর্গে প্রমীলার চিত্রটি কবির পাশ্চাত্ত্য কাব্য অনুশীলনের ফল। পাশ্চাত্ত্য কাব্য—বিশেষত ট্যাসোর জেরুজালেম ডেলিভার্ড অনুশীলন করিয়া কবির অন্তরে এক বীরাঙ্গনা চরিত্রসৃষ্টির আকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছিল। কিন্তু কবি কেবলমাত্র বীরাঙ্গনার চিত্র অঙ্কন করিবার আদর্শটুকুর জন্য পাশ্চাত্ত্য

কবিগণের নিকট ঋণী। চরিত্রটির বর্ণ-বিন্যাস কবির নিজস্ব। প্রমীলা পাশ্চাত্ত্য আদর্শের বীরাঙ্গনা নহেন। পাশ্চাত্ত্যের বীরাঙ্গনাদিগের মত প্রমীলা কেবল রুদ্রের উপাসনা করেন নাই, তিনি মধুরের সাধনাও করিয়াছেন। মধুসূদন তাহার বীরাঙ্গনা প্রমীলা-চিত্রে রুদ্রতেজের সহিত কোমলতার অপরূপ এক সমন্বয় ঘটাইয়াছেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য কল্পনার সমাবেশে প্রমীলা এক নূতন সৃষ্টি হইয়াছে। পাশ্চাত্ত্য বীরাঙ্গনাগণের রুদ্রতার মধ্যে যে মাধুর্যের অভাব—মধুসূদনের প্রমীলায় বীরাঙ্গনার তেজের সহিত সেই মাধুর্যটুকু বর্তমান থাকায় এই চরিত্রটি কবির এক অপরূপ সৃষ্টি হইয়াছে।

প্রমীলার সমরসজ্জা ও লঙ্কাপ্রবেশ বর্ণনার উপরেও প্রতীচ্য কবিকল্পনার প্রভাব রহিয়াছে। লঙ্কায় প্রবেশকালে রতিপতি কামদেব বীরাঙ্গনা প্রমীলার সহচর।—

অন্তরীক্ষে সঙ্গে রঙ্গে চলে রতিপতি
ধরিয়া কুসুম-ধনুঃ, মুহুর্মুহুঃ হানি
অব্যর্থ কুসুম শরে!

ট্যাসোর কাব্যে বীরাঙ্গনা ক্লরিণ্ডা ও আরমিনিয়ার সহচর রতিপতি।—

Fast by her side unseen smiled Venus' son.

পঞ্চম সর্গে মেঘনাদ-কর্তৃক প্রমীলার নিদ্রাভঙ্গের চিত্র মিলটন বর্ণিত অ্যাডাম কর্তৃক ঈভের নিদ্রাভঙ্গের অনুরূপ।

ষষ্ঠ সর্গে বিভীষণের সহিত লক্ষ্মণ মেঘনাদের যজ্ঞাগারে প্রবেশ করিয়া মেঘনাদকে বধ করিতে গেলে, মেঘনাদ অস্ত্রাভাবে পূজার শঙ্খ, ঘণ্টা প্রভৃতির দ্বারা লক্ষ্মণকে আঘাত করিয়াছিলেন। কিন্তু মায়ার প্রসাদে সে সকল লক্ষ্মণকে আঘাত করিতে সমর্থ হয় নাই। কবি ইহার বর্ণনা দিয়াছেন—

কভু বা হানিলা
রথচূড়া, রথচক্র; কভু ভগ্ন অসি,
ছিন্ন চর্ম, ছিন্ন বর্ম, যা পাইলা হাতে!
কিন্তু মায়াময়ী মায়া, বাহু-প্রসারণে,
ফেলাইলা দূরে সবে, জননী যেমতি
খেদান মশকবৃন্দে সুপ্ত-সুত হ'তে
করপদ্ম সঞ্চালনে!

এই অংশটি মহাকবি হোমার রচিত ইলিয়াড্ কাব্যের একটি দৃশ্যের আদর্শে অঙ্কিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। ইলিয়াড্ কাব্যে Menclaus এর প্রতি Pandarus-কর্তৃক নিক্ষিপ্ত বাণ মিনার্ভা সরাইয়া দিয়াছিলেন—

As when a mother from her infant's check
Wrapt in sweet slumbers, brushes off a fly.

মেঘনাদবধ কাব্যে বহুস্থানেই এইরূপ পাশ্চাত্ত্য কাব্য-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ ভাবসমূহ আহৃত হইয়াছে। মেঘনাদবধ কাব্যখানি অনুশীলন করিতে করিতে পাশ্চাত্ত্য কবিগণের অনেক সুন্দর সুন্দর বর্ণনা স্মৃতিপথে উদিত হয়।

কবির মেঘনাদবধ কাব্যের এবং ব্রজাঙ্গনা কাব্যের অন্তর্গত নিম্নোদ্ধৃত বর্ণনার সহিত সেক্সপীয়ারের বর্ণনার সাদৃশ্য আছে।—

আঁচল ভরিয়া ফুল তুলিলা দুজনে।
কত যে ফুলের দলে প্রমীলার আঁখি
মুক্তিল শিশির নীরে, কে পারে কহিতে?

—মেঘনাদবধ কাব্য

এই যে কত মুকুতাফল, এ ফুলের দলে
লো সখি, মোর আঁখিজল, শিশিরের ছলে।

—ব্রজাঙ্গনা কাব্য

Decking with liquid pearl bladed grass.

—Shakespeare, A Midsummer Night's Dream

কবি যখন বলেন যে লক্ষ্মণ ও বিভীষণ—

চলিলা অদৃশ্যভাবে লঙ্কামুখে দোঁহে।

তখন ইলিয়াড্ কাব্যের দেবদূত Hermes-এর সহিত (Priam) প্রায়ামের অদৃশ্যভাবে শত্রুশিবিরে প্রবেশের কথা আমাদের স্মৃতিপথে উদিত হয়।—

Unseen through all the hostile camp they went.

মেঘনাদবধ কাব্যের শেষ সর্গে যেখানে প্রমীলা ও মেঘনাদের চিতার অগ্নি দুগ্ধ-ধারায় নির্বাপিত করা হইয়াছে, সেই স্থানটি হোমারের বর্ণনার অনুরূপ। হেক্টরের চিতা দুগ্ধের পরিবর্তে সুরার দ্বারা নির্বাপিত হইয়াছিল।

The mournful crowds surrounded the pyre,
And quench with wine the yet remaining fire.

The Iliad, Bk XXIV.

অষ্টম সর্গে রামের প্রেতপুরী-দর্শন ইলিয়াডের আদর্শে রচিত—এ কথা কবি নিজেই স্বীকার করিয়া গিয়াছেন—

Mr. Ram is to be conducted through the hell to his father Dasarath like another Aeneas.

মেঘনাদবধ কাব্যের অন্তর্নিহিত প্রধান ভাব দুইটি। প্রথমত—এ কাব্যে মানবতা-ধর্মের জয়গান করা হইয়াছে ; এবং দ্বিতীয়ত—এ কাব্যে দেখানো হইয়াছে যে, নিয়তির তাড়নায় শক্তিশালী মানুষের, বিপুল ঐশ্বর্যের, বিরাট দম্ভের পরাজয়। এই দুইটি প্রধান ভাবের উপরই পাশ্চাত্ত্য প্রভাব কার্যকরী হইয়াছে। গ্রীক আদর্শের দৈববাদ মেঘনাদবধ কাব্যের শিল্পকর্মকে অপূর্ব রসসম্পন্ন করিয়া তুলিয়াছে। অপরিহার্য দৈবদুঃখের আবর্তে পড়িয়া এ কাব্যের পাত্রপাত্রীগণ রোষে ক্ষোভে বিধাতাকে অভিযোগ করিয়া হাহাকার করিয়াছে। বাহিরের একটা দুর্লঙ্ঘ্য শক্তির প্রভাবে মানুষের জীবন কেমন করিয়া ব্যর্থ হইয়া যায়, কেমন করিয়া মনুষ্যজীবনে সুখের সমস্ত আশা কল্পনা ও আয়োজন ব্যর্থ হইয়া যায়, মেঘনাদবধ কাব্যে তাহা দেখানো হইয়াছে। এ কাব্যের মধ্যে আমরা দেখিয়াছি, বিধির বিধানে রাম লক্ষ্মণের জন্য, সীতা তাঁহার অতীত জীবনের কথা স্মরণ করিয়া, চিত্রাঙ্গদা এবং মন্দোদরী পুত্রশোকে, প্রমীলা স্বামিশোকে এবং রাবণ তাঁহার সব হারাইয়া মর্মভেদী হাহাকার করিয়াছেন। গ্রীক সংস্কারের অনুসারী হইয়া মধুসূদন রামায়ণের কাহিনীকে তাঁহার মেঘনাদবধ কাব্যে এইভাবে নিয়ন্ত্রিত করিয়া গিয়াছেন। কবির ব্রজাঙ্গনা, বীরাঙ্গনা কাব্য ও চতুর্দশপদী কবিতাবলীও পাশ্চাত্ত্য প্রভাবের ফল। ব্রজাঙ্গনা কাব্যের বিষয়বস্তু রাধার ভাবাবেগ এবং রাধার প্রেমের আকুতি হইলেও, ইহার মধ্যে বৈষ্ণব সাহিত্যের ভক্তি আদর্শের পরিবর্তে কেবল স্ত্রী ও পুরুষের পরস্পর নিষ্ঠা এবং প্রাণের আকর্ষণ ও আবেগ অভিব্যক্ত হইয়াছে।

বিষয়-নির্বাচনে মধুসূদনের কল্পনা ভারতের পুরাতন কথার মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। কিন্তু ভাব, কল্পনা-ভঙ্গি অথবা ছন্দের নব নব আদর্শের, কিংবা নব নব রচনারীতির প্রবর্তন বিষয়ে এবং কাব্যের নব নব রূপ-সৃষ্টি বিষয়ে মধুসূদন পাশ্চাত্ত্য আদর্শকে অনুসরণ করিয়া চলিয়াছিলেন। এই কারণে মধুসূদনের দ্বারা বাংলা সাহিত্যের অভিনব সৌকর্য সাধন হইয়াছিল এবং বাংলা সাহিত্য বিচিত্রতার ঐশ্বর্য লাভ করিয়াছিল। মধুসূদন-কর্তৃক বঙ্গসাহিত্যে

পাশ্চাত্ত্য প্রভাব প্রবর্তন এবং তাহার ফলে বাংলা সাহিত্যের অতুলনীয় সমৃদ্ধিসাধন সম্বন্ধে কবিবর দ্বিজেন্দ্রলাল রায় যে উক্তি করিয়াছিলেন, তাহা এখানে উদ্ধৃত করিয়া এই পরিচ্ছেদ সমাপ্ত করি—

মাইকেলের সময় হইতেই বঙ্গভাষার নবযুগ। ইংরাজি সাহিত্য যেমন বিদেশীয় সাহিত্যের 'সঞ্জীবনৌষধি-রসে' সঞ্জীবিত হইয়াছিল—যেন একটা উত্তাল ভাবসমুদ্রের বিরাট বন্যা আসিয়া জীর্ণ পুরাতনকে ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া ভাসাইয়া নূতনের জন্য ভূমি প্রস্তুত করিয়া গেল, বঙ্গসাহিত্যও সেইরূপ সেই সময়ে ইংরাজি সাহিত্য-দ্বারা গভীরভাবে আলোড়িত হইয়া উঠিল। বঙ্গীয় লেখকের মুগ্ধ দৃষ্টির সম্মুখে এক গৌরবময় নূতন ভাব রাজ্যের মানচিত্র খুলিয়া গেল ; বঙ্গভাষা নবযৌবন লাভ করিল।

মধুসূদন, হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র

মধুসূদন ছিলেন স্রষ্টা কবি। বাংলা ভাষার অন্তর্নিহিত শক্তির পরিস্ফুটনে বিভোর হইয়া তিনি কাব্যসৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। বাংলায় তিনি সাহিত্য-সৃষ্টির যে নূতন আদর্শের প্রবর্তন করিয়াছিলেন, তাহার জন্য নবযুগের প্রবর্তক কবি হিসাবে তিনি চিরদিন সমাদৃত হইবেন। তিনি আধুনিক যুগের উপযোগী ভাব, ভাষা ও ছন্দ সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার আবির্ভাবে বাংলা সাহিত্যে এমন সব লক্ষণ দেখা দিয়াছিল যে, তাহাতে আমাদের এই মাতৃভাষার সাহিত্যের গতি ও প্রকৃতি বদলাইয়া গিয়াছিল। সাহিত্য তাহার গতিপথ তাঁহার আবির্ভাবের পর হইতেই পরিবর্তিত করিয়াছিল।

সাহিত্যের আধুনিকতা কোন বিশেষ যুগের উপর নির্ভর করে না, নির্ভর করে নূতন লক্ষণের উপর। এ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—

> পাঁজি মিলিয়ে মডারনের সীমানা নির্ণয় করবে কে? এটা কালের কথা ততটা নয়, যতটা ভাবের কথা। নদী সামনের দিকে সোজা চলতে চলতে হঠাৎ বাঁক ফেরে। সাহিত্যও তেমনি বরাবর সিধে চলে না। যখন সে বাঁক নেয়, তখন সেই বাঁকটাকেই বলতে হবে মডারন্। বাংলায় বলা যাক আধুনিক। এই আধুনিকটা সময় নিয়ে নয়, মর্জি নিয়ে।

মধুসূদনের আবির্ভাবে সাহিত্যে নূতন 'ভাবের কথা' দেখা দিয়াছিল, 'নূতন মর্জি' আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল।

আমাদের এই বাংলা সাহিত্যে এমন একটা যুগ ছিল, যখন "রচনা মাত্রেই নিখুঁত রীতির ফোঁটা-তিলক কেটে চলত",—যখন "ব্যক্তিগত অভিরুচির স্বাতন্ত্র্য ও বৈচিত্র্য" চাপা পড়িয়াছিল কতকগুলি বাঁধাধরা Convention-এর দ্বারা। কিন্তু মধুসূদনের আবির্ভাব ইহার ব্যতিক্রম দেখা গিয়াছিল। বাঁধা-ধরা নিয়মনীতিকে অনুসরণ না করিয়া ব্যক্তিগত ভাব-ভাবনাকে, সেই যুগের আশা আদর্শ কল্পনা ও আকাঙ্খাকে তিনি তাঁহার কাব্যমধ্যে প্রকাশ করিয়া-ছিলেন। ইংরাজি সাহিত্যে যেমন বার্নস হইতে শুরু করিয়া ওয়ার্ডসওয়ার্থ, কোলেরিজ, শেলী, কীট্‌স প্রভৃতির মধ্য দিয়া একটা যুগে বাহ্যিকতা হইতে

আন্তরিকতার দিকে কাব্যের স্রোত বাঁক ফিরিয়াছিল, মধুসূদনের কাল হইতে ঠিক সেইভাবে বাংলা সাহিত্য উহার গতি পরিবর্তন করিয়াছিল।

বাংলা সাহিত্যে মধুসূদন কাব্যসৃষ্টির যে আদর্শের প্রবর্তন করিয়াছিলেন, তাহাই হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও নবীনচন্দ্র সেন অনুসরণ করিয়াছিলেন। তবে মধুসূদনের কাব্যাদর্শ হেম-নবীনে অনুসৃত হইলেও ইঁহাদের প্রতিভার বিশেষত্বটুকুও ঐ দুই কবির কাব্যে ও কবিতায় পরিস্ফুট। মধুসূদনের কল্পনা কবিত্বশক্তি ও উদ্ভাবনা-শক্তির সহিত হেম-নবীনের কল্পনা কবিত্বশক্তি ও উদ্ভাবনশক্তির পার্থক্য ছিল। সেই পার্থক্যের এবং তৎসহ হেম-নবীনের প্রতিভার বিশেষত্ব আমরা এই পরিচ্ছেদে আলোচনা করিব।

মধুসূদন শব্দশিল্পী, শব্দাড়ম্বর দ্বারা তিনি কাব্যের মধ্যে একটা গতিবেগ সঞ্চার করিয়াছেন। হেমচন্দ্রের শব্দসম্ভার অল্প; কিন্তু তাঁহার রচনায় যে কঠোর নিরাভরণ সরলতা ও হৃদয়াবেগের উদ্বেলতা আছে, তাহার দ্বারাই তাঁহার কাব্যের মধ্যে পৌরুস-ব্যঞ্জনা সঞ্চারিত হইয়াছে। সাধারণের দুর্বোধ্য শব্দাবলী প্রয়োগ করিয়া মধুসূদন তাঁহার ভাষাকে যে গাম্ভীর্য দান করিয়াছেন, সেই গাম্ভীর্য হেমচন্দ্র ভাবাবেগের মধ্য দিয়া করিয়াছেন। একজন শব্দশক্তির সাধক, অপরজন তেজোব্যঞ্জক ভাবাবেগের ভাণ্ডারী।

মধু ও হেম উভয়েই প্রাচীন মহাকাব্যের পৌরাণিকী আখ্যায়িকা অবলম্বন করিয়া কাব্য রচনা করিয়াছেন। হেমচন্দ্রের সকল রচনার মধ্যে স্পষ্টত বা ইঙ্গিতে স্বদেশপ্রেমের পরিচয় আছে।

মধুসূদন, হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র এই কবিত্রয়ই বিদেশী সাহিত্য হইতে আখ্যায়িকা, ভাব, উপমা ইত্যাদি আহরণ করিয়া বঙ্গসাহিত্যে নূতন আকর্ষণী শক্তি সঞ্চার করেন।

মধুসূদনের উপর পাশ্চাত্ত্য প্রভাবের কথা আমরা আলোচনা করিয়াছি। হেমচন্দ্রের বৃত্রসংহার কাব্যেও পাশ্চাত্ত্য ভাব ও কল্পনাদর্শ বর্তমান। বৃত্রসংহারের প্রথম সর্গের অসুর-মন্ত্রণাসভা মিলটনের অসুর-মন্ত্রণাসভার অনুরূপ, তাঁহার সরস্বতী-আবাহনে মিলটন ও মধুসূদনের প্রভাব। বৃত্রসংহারের শচীহরণ ট্যাসোর কাব্যের সফ্রোনিয়াকে অপহরণ করার ভাব লইয়া রচিত, বৃত্রসংহারের নিয়তিদেবী গ্রীক Fate-এর প্রতিচ্ছায়া। নবীনচন্দ্রে জুলিয়াস সীজার, রিচার্ড দি থার্ড, প্যারাডাইস্ লষ্ট, চাইল্ড্ হ্যারল্ড্ প্রভৃতি কাব্যের কল্পনাদর্শ

বর্তমান—অর্থাৎ সেক্সপীয়ার, মিলটন ও বায়রনের প্রভাব নবীনচন্দ্রে বিদ্যমান। পলাশীর যুদ্ধের প্রথম সর্গে প্যারাডাইস লষ্টের প্রভাব অনুভূত হয়—আর কাব্যখানির আদ্যোপান্ত বায়রনের **Childe Harold**-এর প্রেরণা কার্য করিয়াছে।

মধুসূদনে ভাবরসের যে একটা সরলোজ্জ্বল ওজস্বী প্রবাহ ছিল, হেমচন্দ্রের মধ্যে আসিয়া তাহাই দৃঢ় ও সংযত চরিত্রসৃষ্টিতে ও হৃদয়াবেগের ভাবোচ্ছ্বাসে নিয়োজিত হইয়াছে।

মধুসূদন ইংরেজি **Blank Verse**-এর অনুসরণ করিয়া ছন্দে একটা অবাধ প্রবাহ সঞ্চার করিয়াছিলেন। হেমচন্দ্রের ছন্দে সেই প্রবাহ বা সেইরূপ একটা অবাধ গতিবেগ নাই।

মধুসূদন কাব্যের কাঠামো স্রষ্টা—সেই কাঠামোয় কাদা মাটি রং দিয়া মূর্তি রচয়িতা হেম-নবীন। কাব্যের যে কাঠামো মধুকবি দিয়া গেলেন, তাহারই আধারে হেম-নবীনের কাব্যের চরিত্রসকল এবং স্বাদেশিকতা ফুটিয়া উঠিয়াছে। হেমচন্দ্র চরিত্রসৃষ্টিতে দক্ষতা দেখাইয়াছেন, নবীনচন্দ্রে চরিত্রসৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে ছন্দের প্রবাহ ও উৎকর্ষ আছে।

হেমচন্দ্রের কাব্যে বৈষ্ণব কবিগণের মাধুর্য ও প্রসাদগুণ আছে। কাশীরাম ও কৃত্তিবাসের প্রাঞ্জলতা, কবিকঙ্কণের চরিত্রাঙ্কন-ক্ষমতা, ভারতচন্দ্রের পদলালিত্য, ঈশ্বরগুপ্তের ব্যঙ্গরসিকতা—এ সবই বিদেশী ভাবের সহিত হেমচন্দ্রের কাব্যে মিশিয়াছে।

হেমচন্দ্রের চরিত্রাঙ্কন-দক্ষতা প্রশংসনীয়। বৃত্রসংহারের চরিত্রগুলি ধীরোদাত্ত। এই কাব্যে প্রেম, বীরত্ব, ও স্বার্থত্যাগের যে আদর্শ অঙ্কিত হইয়াছে তাহাতে ইহা জনপ্রিয় হইয়াছে। ভাবসম্পদে মধুসূদনের মেঘনাদবধ এবং হেমচন্দ্রের বৃত্রসংহার উভয়ই তুল্য। কিন্তু ভাষা ও ছন্দ-সম্পদে মেঘনাদবধ কাব্যই উৎকৃষ্ট।

হেমচন্দ্র মহাকাব্য রচনা করিয়াছেন, আবার সুন্দর সুন্দর গীতিকবিতাও রচনা করিয়াছেন। তাঁহার অধিকাংশ কাব্য ও কবিতার মূল সুর স্বদেশপ্রীতি—একথা বলা চলে। তাঁহার কাব্য ও কবিতার মধ্য দিয়া বীর ও করুণ রস উৎসারিত হইয়াছে। তাঁহার ব্যঙ্গকবিতায় দেশের লোক প্রাণ খুলিয়া হাসিয়াছে। হেমচন্দ্র রাজনীতি-বিষয়ক কবিতা রচনা করিয়াছেন, ধর্ম-বিষয়ক কবিতা রচনা করিয়াছেন। কবির 'দশমহাবিদ্যা' ধর্মভাবমূলক

উচ্চাঙ্গের গীতিকবিতা। এই কাব্যের যেখানে কবি শিবের বিলাপ বর্ণনা করিয়াছেন, সেখানে এক নূতন ছন্দ উদ্ভাবন করিয়া প্রয়োগ করিয়াছেন।—

রে সতি! রে সতি! কান্দিল পশুপতি
পাগল শিব প্রমথেশ।
যোগ-মগন হর তাপস যত দিন,
তত দিন না ছিল ক্লেশ।

হেমচন্দ্রের বৃত্রসংহার কাব্য প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য কল্পনার সমন্বয়ে রচিত। পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের বহু শ্রেষ্ঠ সম্পদ্ অনুবাদ করিয়াও হেমচন্দ্র বঙ্গসাহিত্যের পুষ্টিসাধন করেন। পোপ, টেনিসন, ড্রাইডেন প্রভৃতি ইংরাজ কবির কবিতার তিনি সুন্দর অনুবাদ করিয়াছেন। সেক্সপীয়ার, শেলী, প্রভৃতি পাশ্চাত্ত্য কবির রচনা হইতে আখ্যায়িকা, ভাব, উপমা ইত্যাদি আহরণ করিয়া তিনি বাংলা কাব্যসাহিত্যে নূতন সমৃদ্ধি আনয়ন করেন।

আধুনিক যুগোপযোগী গীতিকবিতার পুষ্টিসাধনে হেমচন্দ্রের গীতিকবিতা অনেকখানি সহায়তা করিয়াছিল। চতুর্দশপদী কবিতাবলী মধুসূদনের রচিত উৎকৃষ্ট গীতিকবিতার নিদর্শন। উহাতে কবির ব্যক্তিগত ভাব ও অনুভূতি অভিব্যক্ত হইয়াছিল এবং মধুসূদনের সনেটই আত্মসম্পর্কিত গীতি-কবিতা রচনার একটা নূতন প্রেরণা বাংলা সাহিত্যে জাগাইয়া দিয়াছিল।

হেমচন্দ্রের কবিকল্পনা মধুসূদন হইতে ভিন্ন। সাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষা, বিশ্বাস ও অনুভূতি হেমচন্দ্রের কাব্যে পরিস্ফুট। তদানীন্তন বাংলার সামাজিক জীবনের আশা ও আদর্শ তাঁহার কাব্যে রহিয়াছে।

জগতের কবিদিগকে প্রধানত দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়ঃ যুগপ্রতিনিধি কবি এবং দ্রষ্টা কবি। হেমচন্দ্র প্রথমোক্ত শ্রেণীর কবি। কারণ, সে যুগের কামনা-বাসনা ও আশা-আকাঙ্ক্ষা হেমচন্দ্রে রহিয়াছে। হেমচন্দ্রের কাব্যে সূক্ষ্ম সুরের মাধুর্য সর্বত্র নাই—তবে eloquence আছে। মধুসূদনের মত epic grandeur তাঁহার কাব্যে নাই, আছে গদ্যের মত সহজ সরল স্বচ্ছ বর্ণনা।

হেমচন্দ্রের কাব্যে আধুনিকতার উপকরণ ছিল। তাঁহার কাব্যের form অনেক ক্ষেত্রেই পাশ্চাত্ত্য কাব্যানুযায়ী হইয়াছে। আধুনিক কাব্যাদর্শ অনুযায়ী মধুসূদনের মতই তিনি তাঁহার কবিতায় Stanza ভাগ করিয়াছেন। কাব্যরচনায় মধুসূদন প্রাচীন সংস্কারকে একেবারে ত্যাগ করিয়াছিলেন।

কিন্তু হেমচন্দ্র প্রাচীন সংস্কার একেবারে পরিত্যাগ না করিয়া [illegible] ন ভাষা ও ভঙ্গির সহিত নূতন আদর্শের কাব্যরস মিশ্রিত করিয়া জনসাধারণের মধ্যে পরিবেশন করিয়াছিলেন। পুরাণের কাহিনীকে হেমচন্দ্র আধুনিক ধরণে বিবৃত করিয়াছেন। ফলে মধুসূদনের সৃষ্টির মাধুর্য যাঁহারা ঠিক অনুধাবন ও আস্বাদন করিয়া উপভোগ করিতে পারিতেছিলেন না, তাঁহারাও হেমচন্দ্রের সৃষ্ট নূতন সাহিত্যরসের প্রতি উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছিলেন। হেমচন্দ্র আধুনিক যুগোপযোগী কাব্যরস সর্বসাধারণের প্রাণের নিকট আনিয়া দিয়াছিলেন। ইহাতে বাংলার জনসাধারণ কাব্যের নূতন ভঙ্গি ও রসের সহিত পরিচিত হইয়াছিল।

খ্রীষ্টীয় ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগে রঙ্গলাল, মধুসূদন, হেম, নবীন—যে কয়জন কবি বাংলার কাব্যসাহিত্যক্ষেত্রে আবির্ভূত হইয়া কাহিনীকাব্য বা মহা-কাব্য রচনা করেন, তাঁহাদের সকলেরই কাব্যের ও কবিতার মূলকথা দেশপ্রীতি। নবীনচন্দ্রের কাব্যের মূলকথাও দেশপ্রীতি। পলাশীর যুদ্ধ ও রঙ্গমতী নবীনচন্দ্রের দেশপ্রীতির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তাঁহার বিখ্যাত কাব্যত্রয়—রৈবতক, কুরুক্ষেত্র ও প্রভাসেও দেশপ্রীতি উৎসারিত হইয়াছে। এই কাব্যত্রয়ে কবি মহাভারতের আখ্যায়িকাকে নূতন ছাঁচে ঢালিয়াছেন। সেখানে শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন একটা বিশাল ভারত-সাম্রাজ্য, একটা মহান্ ধর্ম স্থাপন ও প্রবর্তন করিতে চাহিয়াছেন। এই কাব্যত্রয়ে কবির পরিকল্পনা অতি সুন্দর। সে যুগে জাতির মনে সামাজিক রাজনৈতিক ও ধর্মের যে উচ্চ ভাব জাগাইয়া তোলার প্রয়োজন ছিল, তাহা কবি এই কাব্যত্রয়ের সাহায্যে জাগাইয়া তুলিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। কাব্যের মধ্যে নিখুঁত দেশানুরাগ ও ধর্মতত্ত্ব প্রকাশ করাই নবীনচন্দ্রের বিশেষত্ব। কিন্তু দেশানুরাগ বা ধর্মতত্ত্ব নিছক কল্পনা অথবা কবিত্বের উপর ভিত্তিলাভ করিয়া রূপ পাইতে পারে না। সেইজন্য ভাব ও ভাবনায় নবীনচন্দ্রের কাব্য সমৃদ্ধ হইলেও কাব্যহিসাবে তাঁহার রচনা পূর্ণ উৎকর্ষ লাভ করে নাই।

মধুসূদনের মত নবীনচন্দ্রের কল্পনা কাব্যপ্রধান (Poetic) নহে। তাঁহার কাব্যরস সৌন্দর্যময় নহে। তবে তাঁহার কল্পিত বিষয়বস্তুর চমৎকারিত্ব আমাদিগকে বিস্মিত করিয়াছে। আধুনিক যুগের ভাবধারার সহিত মহাভারতের আখ্যায়িকার সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া কাব্যরচনা তাঁহার কৃতিত্বের পরিচায়ক।

বঙ্কিমচন্দ্র ..শার কৃষ্ণচরিত্রে যেভাবে ইতিহাসের আদর্শকে নূতন দৃষ্টি লইয়া পুনরুদ্ধার করিয়াছিলেন, নবীনচন্দ্রের রৈবতক, কুরুক্ষেত্র ও প্রভাসে সেই দৃষ্টিভঙ্গি বর্তমান দেখিতে পাওয়া যায়। বঙ্কিমের কৃষ্ণচরিত্রে ও নবীনচন্দ্রের সৃষ্ট কৃষ্ণচরিত্রে সাদৃশ্য আছে। একটা প্রবল ভাবপ্রবণতা নবীনচন্দ্রের কাব্যের বিশেষত্ব। কবির সেই ভাবপ্রবণতা অপূর্ব সুরে ও ঝঙ্কারে প্রকাশ পাইয়াছে তাঁহার কাব্যসমূহে।

রঙ্গলালে আর হেমচন্দ্রে অনেক ক্ষেত্রেই ভাব ভাষা ও ছন্দের জড়তা আছে। কিন্তু মধুসূদনে ও নবীনচন্দ্রে ভাবের সৌষ্ঠব, ভাষার নমনীয়তা, ছন্দের একটা অপরূপ আবেগ, গতি ও ঝঙ্কার আছে। নবীনচন্দ্রের দেশপ্রীতি তাঁহার কাব্যসমূহে কবিত্বমণ্ডিত হইয়া রূপ পাইয়াছে। তাঁহার পলাশীর যুদ্ধ সুরে ও ঝঙ্কারে অতি উপাদেয় কাব্য হইয়াছে।

নবীনচন্দ্রের কাব্যসৃষ্টিতে ছিল ভাষার ও ভাবের উচ্ছ্বাস, ছিল Byron-এর মত আবেগের উদ্বেলতা ও প্রবলতা। অবশ্য এই 'আবেগবহুলতা (emotionalism) মধ্যে মধ্যে তাঁহার কাব্যের ত্রুটিস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগে আবির্ভূত কবিদিগের মধ্যে ছিল ভাব ও ভাবনার আতিশয্য—কোন একটা বিশেষ চিন্তাকে, জাতির অথবা ব্যক্তির আদর্শকে প্রকাশ এবং প্রতিষ্ঠার উৎকণ্ঠাই ছিল তাঁহাদের প্রবল প্রবৃত্তি। খাঁটি কাব্যরস পরিবেশন, অথবা কাব্যকলার উৎকর্ষসাধনের প্রবৃত্তি এ যুগে আবির্ভূত কবিগণের মধ্যে শুধুমাত্র মধুসূদনে, নবীনচন্দ্রে আর বিহারীলালে পরিলক্ষিত হইয়াছে।

পলাশীর যুদ্ধে দেশানুরাগের কথা বাদ দিলেও,— কাব্যহিসাবে উহা নবীনচন্দ্রের এক অপূর্ব সৃষ্টি। কল্পনার সংযত লীলায়, ছন্দের মাধুর্যে, গাম্ভীর্যে ও সংযমে—ভাষার লীলাচাঞ্চল্যে ও গতির দ্রুততায় এই কাব্য অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী।

মধুসূদনের মহাকাব্য কবিপ্রেরণার সৃষ্টি—মধুসূদনে তত্ত্ব নাই, চিন্তা নাই, আছে নিছক কবিকল্পনার বিকাশ। নবীনচন্দ্রের মহাকাব্যে—রৈবতকে, কুরুক্ষেত্রে, প্রভাসে—কবি তত্ত্ব ও চিন্তাকে কবিত্বমণ্ডিত করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। মধুসূদনের কাব্যে, অথবা নবীনচন্দ্রের কাব্যে যে ধরণের কবিদৃষ্টি ও কাব্যকুশলতার পরিচয় বর্তমান, হেমচন্দ্রে তাহার একান্ত অভাব।

নবীনচন্দ্রের রৈবতক, কুরুক্ষেত্র ও প্রভাসে ইউরোপীয় মহাকাব্যের বিশালতা আসিয়া গিয়া সেগুলিকে অপূর্ব করিয়া তুলিয়াছে।

বাংলার প্রাচীন ছন্দ পয়ারের নূতন ঝঙ্কার ও ধ্বনি আবিষ্কার করেন মধুসূদন অমিত্রাক্ষর ছন্দের উদ্ভাবন করিয়া। মধুসূদনের ছন্দের সেই ধ্বনিটিকে ধরিতে পারিয়াছিলেন নবীনচন্দ্র। তাই তিনি তাঁহার পলাশীর যুদ্ধে এবং অন্যান্য কাব্যেও পয়ারের স্বাধীন ও স্বচ্ছন্দ গতিকে লীলায়িত করিয়া তুলিয়াছেন। হেমচন্দ্র মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দের মাধুর্য ধরিতে পারেন নাই বলিয়াই, বিভিন্ন ছন্দের ব্যবহার করিয়া তিনি তাঁহার বৃত্রসংহার কাব্য রচনা করিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার কাব্যের বিষয় ও কল্পনা আধুনিক যুগোপযোগী হইলেও, কাব্যের সুরটি কেমন যেন বেসুরা বাজিয়াছে।

কাব্যের আদর্শে, কল্পনায় এবং ছন্দের ক্ষেত্রে যে বৈচিত্র্যের সন্ধান মধুসূদন দান করিয়াছিলেন, তাহাকেই লালন করিয়া হেম-নবীন বঙ্গের পাঠকসমাজের রুচি ও প্রবৃত্তির স্রোত আধুনিক যুগোপযোগী কাব্যের দিকেই ফিরাইয়া দিয়াছিলেন। মধুসূদন, হেম ও নবীনের কাব্য ও কবিতা প্রকাশের পর বঙ্গ-সাহিত্যে যে আদর্শ প্রবর্তিত হইল, তাহাতে বিদ্যাসুন্দরের ন্যায় আদিরসাত্মক কাব্য, অথবা শুধুমাত্র অনুপ্রাসবহুল কাব্য বা কবিতা যে আর বাংলার শিক্ষিত-সমাজে প্রতিষ্ঠালাভ করিবে, সে সম্ভাবনা রহিল না। অতঃপর বাংলা কাব্যসাহিত্য সম্পূর্ণ নূতন পথ ধরিয়া অগ্রসর হইয়া চলিল।

নিদর্শনী